ইসলাম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১

পানি ব্যবহার করে
সাবান দিয়ে ফেনা
তৈরি করতে হবে

২

দুই হাতের পেছন
থেকে আঙুলের ফাঁক
পরিষ্কার করতে হবে

৩

দুই হাতের তালু এবং
আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার
করতে হবে

৪

দুই হাতের আঙুল
আলতোভাবে মুঠো করে
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫

দুই হাতের বুড়ো আঙুল
হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে
পরিষ্কার করতে হবে

৬

এক হাতের পাঁচ আঙুলের
নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭

দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত
ভালোভাবে পরিষ্কার
করতে হবে

৮

হাত ভালোভাবে ধুয়ে
শুকনো পরিষ্কার কাপড় বা
টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইসলাম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রূফ
অধ্যাপক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম
ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
ড. আমীর হোসেন
মোঃ আবু হানিফ
ড. মোহাম্মাদ মাসুম বিল্লাহ
ইফফাত নাওমী
মুহাম্মদ আবুল মনসুর
ড. মোঃ ইকবাল হায়দার
উম্মে কুলসুম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

নূর-ই-ইলাহী

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

মো: আ: হান্নান বিশ্বাস

মো. সাদ্দাম হোসাইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায় পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকটির মাধ্যমে শিখন হবে গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী,

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের নতুন বইটিতে স্বাগত!

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের এই বইটি তোমাদের আগের বইগুলো থেকে অনেক আলাদা। কেন জানো? কারণ, এই বইটি তোমাদের জন্য কেবল পাঠ্যপুস্তক নয় বরং এটি ইসলামী আদর্শে সুন্দর জীবন গঠনের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

এবারের ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি শেখার সময় তোমরা আনন্দের সাথে বেশ কিছু সুন্দর কাজ করবে এবং নানারকম অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এই কাজগুলো করতে তোমাদেরকে তোমাদের শিক্ষক সহায়তা করবেন, সেই সাথে তোমরা সহপাঠী বন্ধুরা নিজেরা মিলেমিশেও কাজগুলো সুন্দরভাবে করতে পারবে। একই সাথে অভিজ্ঞতা অর্জনের সেই কাজগুলো করতে তুমি এই বইটিরও সহায়তা নিতে পারবে।

ইসলাম শিক্ষায় এবার আমরা অভিজ্ঞতা অর্জনের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। কিছু কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে আমরা শিখে যাব ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়। তবে এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের বিশেষ কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তোমরা কিন্তু আগের মতো শুধু পড়বে বা মুখস্থ করবে না। তোমরা জানবে, বুঝবে, অভিজ্ঞতা অর্জন করবে আর বন্ধুদের সাথে মিলে আনন্দের সাথে কিছু কাজ করবে!

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
অধ্যায় ১	আকাইদ	১
	তাওহিদ	৮
	রিসালাত	১২
	আখিরাত	১৬
অধ্যায় ২	ইবাদাত	২৬
	তাহারাত	২৯
	নাজাসাত	৩০
	ওযু	৩২
	গোসল	৩৪
	তায়াম্মুম	৩৪
	সালাত	৩৭
অধ্যায় ৩	কুরআন ও হাদিস শিক্ষা	৫১
	তাজবিদ	৫৪
	মাখরাজ	৫৫
	সূরা আল-ফাতিহা	৫৮
	সূরা আন-নাস	৬১
	সূরা আল-ফালাক	৬৪
	সূরা আল-ইখলাস	৬৬
	সূরা আল-হুমাযাহ	৬৮
	অর্থসহ মুনাজাতের তিনটি আয়াত	৭১
	আল-হাদিস	৭৩
অধ্যায় ৪	আখলাক	৮০
	আখলাকে হামিদাহ	৮১
	আখলাকে যামিমাহ	৯৩
অধ্যায় ৫	জীবনাদর্শ	৯৯
	মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)	৯৯
	হযরত আবু বকর (রা.)	১০৩
	হযরত খাদিজা (রা.)	১০৪
	ইমাম আবু হানিফা (রহ.)	১০৫
	হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)	১০৭
অধ্যায় ৬	সহাবস্থান	১১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাঈদ

প্রিয় শিক্ষার্থী,

আমরা প্রথম কিছু দিন ইসলামের মৌলিক ধারণাগুলো সম্পর্কে জানব। তবে, এই জানাটা হবে একটু অন্যভাবে। শিক্ষক তোমাদের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমরা হয়তো কোথাও ঘুরতে যাবে, কিছু কাজ করবে, বন্ধুরা মিলে নিজেরা কে কী জানো তা আলোচনা করবে। আর এই সব কাজ করতে করতে তোমরা ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা পাবে। এখানে একটি ব্যাপার জেনে রাখো, তুমি হয়তো ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে অনেক কিছু আগে থেকেই জানো। সেই বিষয়গুলো তুমি বন্ধুদের জানাতে পারবে। বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে এবং শিখতে তোমরা একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে। চলো জেনে নিই কী সেই অভিজ্ঞতা!

ঘুরতে যাওয়া

প্রথমেই শিক্ষক তোমাদের সবাইকে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যেতে পারেন। সেখানে তোমরা সবাই ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দেখতে পারবে। এ সময় তোমাকে শিক্ষক কিছু প্রশ্ন করবেন, তুমি সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। উত্তর ভুল হলেও কোনো সমস্যা নেই। আমরা সবাই ভুল করতে করতেই সঠিক বিষয়টি শিখি। এ সময় তোমার মনে নানা প্রশ্নও জাগতে পারে। তুমি অবশ্যই শিক্ষককে সেই প্রশ্নগুলো করবে। মনে রাখবে, প্রশ্ন করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। জানার জন্য তুমি তোমার শিক্ষককে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো।

এই ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে তোমার মূল কাজ হলো আশপাশের সবকিছু মনোযোগ দিয়ে দেখা। আমরা আমাদের আশপাশের অনেক কিছুই কিন্তু সময়ের অভাবে ভালোভাবে লক্ষ করি না। সবকিছু লক্ষ করবে আর বুঝতে চেষ্টা করবে যে সেগুলো কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক যদি তোমাদের বিশেষ কিছু দেখান, তাহলে সেটা মনোযোগ দিয়ে দেখবে আর শিক্ষকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। লক্ষ করো, তোমাদের সাথে কি এমন বন্ধু আছে, যার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা যে চোখে দেখতে পায় না? তাহলে এমন বন্ধুকে সাহায্য করা কিন্তু

তোমার দায়িত্ব! তোমার বন্ধুকে বলো যে তোমরা কী দেখছ আর কি কি করছ। সেই বন্ধুর সাথে মিলে শিক্ষকের বলা সব কাজগুলো করো।

প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

ঘুরতে গিয়ে শিক্ষক তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিলেন তুমি কি সেগুলো নিয়ে ভেবেছ? প্রশ্নগুলোর কি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছ? তোমার বন্ধুরা যে উত্তর দিয়েছে তা কি তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছ? নিশ্চয়ই এতক্ষণে তুমি বেশ কিছু নতুন জিনিস জেনেছ। অথবা, এমনও হতে পারে যে তুমি আগে থেকেই এগুলোর অনেক কিছু জানতে! এখন তোমাকে শিক্ষক একটি আনন্দদায়ক কাজ করতে দেবেন। তোমাকে কী করতে হবে জানো?

এখন তুমি যা যা আগে থেকে জানো আর যা যা ঘুরতে গিয়ে জানলে, তোমাকে সেই সবকিছু লিখে ফেলতে হবে। তাহলে এখন নিচের কাজ-১ করে ফেলো!

কাজ-১

আকাইদের মৌলিক বিষয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

মনে রাখবে, সব সময় যে সবার সব লেখা বা জানা সঠিক হবে তা নয়। মাঝে মধ্যে কিছু ভুল হতেই পারে। তাই ভয় বা লজ্জা না পেয়ে তোমাদের মতো করে এই প্রশ্নটির উত্তর লিখে ফেলবে। এরপর আমাদের আরও অনেক কাজ আছে!

তুমি নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে কাজ-১ সম্পন্ন করেছ। তার মানে হলো এখন তোমার কাছে একটি তালিকা আছে, যেখানে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে লেখা আছে। তবে তালিকার কিছু জিনিস ভুলও হতে পারে, তাই না? কারণ, তালিকাটিতে তো তুমি শুধু তোমার যা যা মনে হয় সেগুলো লিখেছ। এখন তাহলে আরেকটা কাজ করতে হবে।

তবে আরেকটা কাজ করার আগে জেনে নিই কেন আমরা এতসব কাজ করছি। তোমাদের শিক্ষক নিশ্চয়ই তোমাদের জানিয়েছেন সেটা। তা-ও আবার জানাচ্ছি, তোমাদের মূল কাজ হলো আসলে একটি খুব সুন্দর দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা আর সেটা সবার সামনে উপস্থাপন করা। কারণ, আমরা সবাইকে জানাতে চাই যে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা আকাইদের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে কতকিছু জানো!

কিন্তু কেবল তোমাদের ছোট ছোট তালিকা, ভাবনা আর ধারণা দিয়ে তো একটা সুন্দর দেয়াল পত্রিকা হবে না! কারণ, নিজেদের জানায় তো কিছু ভুলও থাকতে পারে। তাই এখন তোমার এই জানার জগৎটাকে আরও বড় করতে ছোট ছোট আরও কিছু কাজ করতে হবে। তাহলে এখন এসো জেনে নিই আমরা এই দেয়াল পত্রিকাটি তৈরি করার জন্য ধাপে ধাপে কি কি কাজ করব।

১. আকিদার মৌলিক বিষয়গুলোর তালিকা তৈরি করা

↓

২. তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা সমৃদ্ধ করা

↓

৩. আকিদার মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করা

↓

৪. দেয়াল পত্রিকার জন্য লেখা, কাগজ, কলম, রং, ডিজাইন ইত্যাদি ঠিক করা

↓

৫. শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে লেখার ভুল সংশোধন করা

↓

৬. দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধনের জন্য অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা

↓

৭. দেয়াল পত্রিকা লেখা, সাজানো এবং দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধনের জন্য অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বা দাওয়াত কার্ড তৈরি করা

↓

৮. আমন্ত্রণপত্র বা দাওয়াত কার্ড বিতরণ করা এবং অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া

↓

৯. অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন করা

তাহলে দেখো, দেয়াল পত্রিকা তৈরির প্রথম ধাপের কাজ কিন্তু তুমি করে ফেলেছ। এখন দ্বিতীয় ধাপের কাজের জন্য তুমি কারও কাছে জানতে চাইবে, আকিদার মৌলিক বিষয় বা মূল বিষয়গুলো আসলে কি কি? পারবে না? বাড়িতে বড় যে কাউকেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারো তুমি। বাড়িতে কেউ না থাকলে তোমার পরিচিত বড় কারও সাহায্যও নিতে পারো। অথবা, তুমি তোমার যে কোনো শিক্ষকের কাছ থেকেও বিষয়গুলো জেনে নিতে পারো। তারপর কী করতে হবে জানো? তুমি যে প্রথমে একটি তালিকা তৈরি করেছিলে, সেটিতে নতুন যা যা জানলে তা লিখে ফেলতে হবে। তাহলে কী হবে? তাহলে তোমার তালিকাটি এখন আরেকটু বড় আর সুন্দর হবে! তাহলে এবার তোমার কাজটি হলো-

কাজ-২

বড় কারও কাছ থেকে জেনে নিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত তোমার তালিকাটি সমৃদ্ধ করো।

আশা করি তুমি কাজ-২ ভালোভাবে শেষ করেছ। এখন কী হলো বলোতো? এখন তোমাদের বন্ধুদের কাছে একটা করে বড় তালিকা আছে, তাই না? আমাদের এবারের কাজটা আরও অনেক আনন্দের! এবার আমরা বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে যাব। কীভাবে দল তৈরি করতে হবে তা শিক্ষক তোমাদের বলে দেবেন। দলে ভাগ হয়ে এবার তোমরা দলের সবার তালিকাগুলো দেখবে। আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করবে যে কার তালিকায় কী আছে। আরও দেখবে তোমার তালিকার কোনো কিছুর সঙ্গে তোমার দলের কোনো বন্ধুর তালিকার কিছু মিলে যায় কি না। মিলে গেলে তো খুব ভালো হলো! তার মানে তোমরা একই জিনিস জেনেছ। তবে, হয়তো সবার তালিকাতেই এমন কিছু থাকবে যা অন্যদের তালিকায় নেই। এ সবকিছু তোমরা সবাই একসঙ্গে গোল হয়ে দলে বসে বোঝার চেষ্টা করবে। আর তারপর তোমাদের আরেকটি কাজ করতে হবে। কাজটা হলো-

কাজ-৩ (দলগত কাজ)

দলের সবার তালিকায় যা যা আছে তার সবকিছু মিলিয়ে একটি বড় তালিকা তৈরি করো।

কাজ-৩, এটি একটা দলগত কাজ। এর মানে হলো, তোমাকে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে একদল হয়ে কাজটা করতে হবে। আর কাজটা করার পর দলে এখন মাত্র একটি করে বড় তালিকা থাকবে।

দলগত উপস্থাপন

এখন তোমাদের দলগুলোর কাছে আছে একটি করে তালিকা। তালিকায় আছে তোমরা আকিদার মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে যা জানো তা আর বড়দের কাছ থেকে যা জেনেছ তা। এবার তাহলে জানতে হবে অন্য দলগুলোর তালিকায় কি কি আছে। কিন্তু সেটা কীভাবে জানা যাবে? সেটা জানার জন্য এখন তোমাদের সব দল সবার সামনে তাদের তালিকা উপস্থাপন করবে। তাহলে এবারের কাজ হলো-

কাজ-৪ (দলগত উপস্থাপন)

তোমাদের দলের তালিকাটি সবার সামনে উপস্থাপন করো।

সবার সামনে উপস্থাপন করার ব্যাপারটা অনেকের কাছে কঠিন বা ভয়ের কাজ মনে হলেও আসলে মোটেও তা নয়। তোমরা দলের সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষের সামনে গিয়ে সবাইকে জানাবে যে তোমাদের তালিকাটিতে কি কি আছে। ব্যস! এটুকুই কাজ। তবে কাজটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে করার চেষ্টা করতে হবে। কোনো দল হয়তো বড় কাগজে লিখে নিয়ে তাদের তালিকাটি দেখাতে পারে। আবার কেউ কেউ বোর্ডে গিয়ে লিখে দেখাতে পারে। কেউ বা শুধু মুখে বলেও উপস্থাপন করতে পারে। তুমি তোমার দলের সঙ্গে মিলে ঠিক করে নাও যে তোমরা কীভাবে তোমাদের তালিকাটি উপস্থাপন করবে। সব দলের উপস্থাপন হয়ে গেলে এবার তোমাদের যে কাজটা করতে হবে, সেটা আরও আনন্দের। এবার তোমাদের সব দলের সবকটি তালিকা মিলিয়ে একটি তালিকা তৈরি

করতে হবে। এটা করতে তোমাদের শিক্ষক সহায়তা করবেন। শিক্ষকের কথামতো কাজ করে সহজেই তোমরা এই বড় তালিকাটি তৈরি করে ফেলতে পারবে। তাহলে এবারের কাজ হলো-

কাজ- ৫

শিক্ষকের সহায়তায় সব দলের তালিকা মিলিয়ে একটি বড় তালিকা তৈরি করো।

কাজ ৫ শেষ করার পর তোমাদের বড় তালিকা তো হয়ে গেল! কিন্তু এই বড় তালিকাটিতে কি সবকিছু আছে? নিশ্চয়ই না! ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর আরও নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে যা তোমরা জানো না। আবার এই তালিকায় যা যা লিখেছ তার কিছু কিছু হয়তো ভুলও হতে পারে। তাই না? তাহলে, দেয়াল পত্রিকা তৈরির আগে সেসব জেনে নিয়ে ঠিক করে নিতে হবে। কারণ, দেয়াল পত্রিকায় তো ভুল লেখা যাবে না!

তো, তোমরা যা জানো না তা জানার উপায় কী? বা তোমাদের কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধনেরই-বা উপায় কী? তোমাদের শিক্ষক, তা-ই না? শিক্ষকই জানাতে পারবেন আরও নতুন কিছু। আর ভুলগুলোও শুধরে দিতে পারবেন। তিনি হয়তো এর মধ্যেই তোমাদের অনেকের অনেক ভুল শুধরে দিয়েছেন। কিন্তু তার হয়তো আরও অনেক কিছু জানানোর আছে। এবার তাহলে আমরা যাব দেয়াল পত্রিকা তৈরির কাজের ৩ নম্বর ধাপে!

আরও জেনে নিই

এবার শিক্ষক তোমাদের সামনে বেশ কিছু বিষয় উপস্থাপন করবেন। তোমার কাজ হবে শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা আর তিনি কোনো কাজ দিলে তা সঠিকভাবে করার চেষ্টা করা। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে তা বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। তোমাদের বড় তালিকাটির কোন বিষয়টি শিক্ষকের কোন কথার সাথে মিলে যায়, সেটিও বোঝার চেষ্টা করবে। শিক্ষকও এই ব্যাপারে সহায়তা করবেন।

এবার তোমার শিক্ষক তোমাদের সামনে একে একে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরবেন। এই বইটি থেকে পড়েও শিক্ষক যা বলবেন তার অনেক কিছু জেনে নিতে পারো।

আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা কি কখনো বাতাস দেখেছ? নিশ্চয়ই তোমরা দেখোনি। বাতাস দেখা যায় না তাই বলে কি বাতাসের অস্তিত্ব নেই? বাতাস সরাসরি দেখা না গেলেও বাতাসের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি আমাদের অস্বীকার করার কি কোনো উপায় আছে? নিশ্চয়ই নেই। কারণ, অদৃশ্য হলেও আমরা সবাই এর অস্তিত্ব অনুভব করি। তাই আমরা বাতাসের অস্তিত্বকে স্বীকার ও বিশ্বাস করি। আবার আমাদের শরীরের কোনো অঙ্গে যখন কোনো ব্যথা হয় তাও আমরা সরাসরি দেখতে পাই না কিন্তু অনুভব করি ও বিশ্বাস করি। এমনিভাবে আমাদের ধর্ম ইসলামেও এমন কিছু দিক ও বিষয় আছে যা আমরা সরাসরি চোখে দেখতে পাই না কিন্তু তা সত্য ও বাস্তব। আর এগুলোকে আমাদের দৃঢ়ভাবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হয়। এগুলো ইমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়।

ইসলামে বিশ্বাসের বিষয়সমূহকে বলা হয় আকাইদ। একজন মুমিন হতে হলে সবার আগে আমাদের আকাইদের বিষয়সমূহে বিশুদ্ধ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা আকাইদ সম্পর্কে জানব।

আকাইদ এর ধারণা

'আকাইদ' আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো বিশ্বাসমালা। এটি বহুবচন। এর একবচন আকিদাহ (اَلْعَقِيْدَةُ), যার অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাসকেই 'আকাইদ' বলা হয়। যেমন: আল্লাহ, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, আখিরাত, তাকদির ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। মুমিন হতে হলে সর্বপ্রথম এসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ ইমান বা বিশ্বাসের বিষয়টিকেই আকাইদ বলা হয়।

যে কোনো কাজ করার আগে তার প্রতি যদি আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে তাহলে সে কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মায় না। ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলে সকল মানবিক গুণ অর্জনের জন্যও এ ইমান এবং আকিদাহ বা বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য।

কালিমা তাইয়্যেবাহ: ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য যা অন্তরে বিশ্বাসের সাথে মুখে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যা হলো–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।' এটিকে কালিমা তাইয়্যেবাহ বলা হয়।

কালিমা শাহাদাত: ইমান বলতে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন, তার সবকিছুকে অন্তরে বিশ্বাস করাকে বোঝায়। অন্তরের বিশ্বাসকে জানাতে হলে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে হয়। সেজন্য আরেকটি কালিমা এভাবে রয়েছে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল।' এটিকে 'কালিমা শাহাদাত' বলা হয়।

আমরা জানলাম, আকিদাহ হলো ইমানের বিস্তারিত বিষয়সমূহে বিশ্বাস। আল্লাহ এবং আকাইদের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ কেমন হবে তা শুদ্ধরূপে জেনে অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। একইভাবে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সকল প্রমাণিত বৈশিষ্ট্যও বিশ্বাস করতে হবে। যেমন- তিনি যে শেষ নবি তা বিশ্বাস করা। মহানবি (সা.) কে যথাযথ মর্যাদা না দেওয়া বা তাঁকে কোনোভাবে হেয় জ্ঞান করা হলে সেটি হবে ইমান-বহির্ভূত এবং মারাত্মক গুনাহের কাজ।

ইমান মুজমাল: ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয়টিই হলো আল্লাহ তা'আলা এবং মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর ইমান আনা বা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। তবে ইমান বা বিশ্বাস স্থাপনের পর যদি ইসলামের নিয়ম-

নীতি না মানা হয় বা ইসলামের প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয় তবে তা ইমান-আকিদার পরিপন্থী কাজ হবে।

ইমান সম্পর্কিত এসব বিষয় সবার জানা থাকে না। তাই সংক্ষিপ্তভাবে ইমানের একটি অঙ্গীকার বাণী আছে, যাকে বলা হয় 'ইমান মুজমাল'। যা নিম্নরূপ–

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

অর্থ: 'আমি ইমান আনলাম আল্লাহর ওপর ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তাঁর সকল নাম ও গুণসহ। আর আমি তাঁর সকল হুকুম ও বিধি-বিধান গ্রহণ করে নিলাম।'

ইমান মুফাসসাল: কেবল আল্লাহর প্রতি ইমান আনলেই মুমিন হওয়া যায় না; বরং একইসাথে তাঁর প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতিও ইমান আনতে হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে ইমান এবং আকিদাহ বা বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এজন্য ইমানের একটি অঙ্গীকার বাণী আছে যাকে 'ইমান মুফাসসাল' বলা হয়। এটি নিম্নরূপ–

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَآئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ: 'আমি ইমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি, তাকদিরের প্রতি যার ভালো-মন্দ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকেই হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

এ কারণেই আমরা আমাদের মহানবি (সা.) এর পূর্বের নবিগণকে এবং তাঁদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করি। তবে তাঁদের কিতাব ও বিধি-বিধান আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়। আমরা কেবল আমাদের নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর প্রেরিত ওহি তথা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে অনুসরণ ও অনুকরণ করব। কারণ, ইসলাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ

অর্থ: 'নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯)

পাঠচক্র

শিক্ষকের সহায়তায় কালিমা তাইয়্যেবাহ, কালিমা শাহাদাত,
ইমান মুজমাল ও ইমান মুফাসসাল অনুশীলন করো।

এ অধিবেশনের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ইসলামে প্রবেশ করতে হলে সবার আগে আমাদেরকে আকাইদের বিষয়সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত কেউ ইমানদার হতে পারে না।

কাজ-৬ (বাড়ির কাজ)

আকাইদের বিষয়াবলিতে বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি এক পাতার প্রতিবেদন তৈরি করো।

প্রিয় শিক্ষার্থী! উপরোক্ত আলোচনা থেকে আকাইদ তথা ইমানের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে তুমি প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছ। এ শ্রেণিতে আমরা ইমানের বিষয়সমূহের মধ্য থেকে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা করব।

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْدُ)

তাওহিদ এর ধারণা

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْدُ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ আল্লাহর একত্ব। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলা এক ও একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিজিকদাতা। তিনি ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই। তিনিই হলেন একমাত্র ইলাহ্। তিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলার প্রতি এরূপ বিশ্বাসই হলো তাওহিদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

অর্থ: 'বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন (সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।' (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-৪)

তাওহিদ এর তাৎপর্য

ইমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে তাওহিদ অন্যতম। ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাওহিদের মূল বাণী হলো– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।' তিনি সবকিছুর স্রষ্টা

ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। ফলে আসমান ও জমিনের সবকিছু সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। যেমন পবিত্র কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে–

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ

অর্থ: 'যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকতো, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২২)

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবি-রাসুল মানুষের নিকট তাওহিদের বাণী প্রচার করছেন।

তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব

একজন মানুষকে মুসলিম হতে হলে সর্বপ্রথম তাওহিদে বিশ্বাসী হতে হয়। তাওহিদে বিশ্বাস ছাড়া কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারে না। তাওহিদের শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নবি-রাসুলগণ আজীবন চেষ্টা করেছেন। একজন মুসলমানের জন্য তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ–

- আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়।
- তাওহিদে বিশ্বাসীরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত করে না। এতে তাদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বেড়ে যায়।
- তাওহিদে বিশ্বাসীরা আল্লাহর গুণাবলির পরিচয় জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করে। ফলে তাদের আচরণ ও চরিত্র সুন্দর হয়।
- তাওহিদে বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তাই তারা সকলকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে এবং সমাজে সকলের সাথে মিলেমিশে চলতে চেষ্টা করে।
- তাওহিদে বিশ্বাস একজন মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে। তাই তাওহিদে বিশ্বাসীরা আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করার চেষ্টা করে। ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।
- তাওহিদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সবসময় দেখছেন। ফলে সে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে।

দলগত আলোচনা

কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করো।
আলোচনার বিষয়বস্তু: আমরা কেন তাওহিদে বিশ্বাস করব?

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও মালিক। আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন, 'আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৫) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, 'তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।' (সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৩)

আল্লাহর গুণাবলি

আল্লাহ তা'আলা সকল গুণের অধিকারী। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এ মহাজগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি আমাদের অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। আলো, বাতাস, পানি, খাদ্যসহ পৃথিবীতে এবং আকাশে যা কিছু আছে সব তারই দান। আল্লাহ তা'আলার রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। এসব নামের মধ্যেই তাঁর গুণাবলি প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এসব গুণাবলি অনুসরণ করলে আমরা চরিত্রবান হতে পারবো এবং সমাজে নৈতিকতা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

নিম্নে আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি গুণবাচক নাম আলোচনা করা হলো:

আল্লাহ রাহিমুন (اَللّٰهُ رَحِيْمٌ)

রাহিমুন অর্থ পরম দয়ালু। আল্লাহ তা'আলা অসীম দয়ালু। সবকিছুর ওপর তাঁর রহমত বিরাজমান। হাদিসে বর্ণিত আছে যে, "কোনো এক যুদ্ধবন্দীদলকে মহানবি (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসা হলো। এসময় একজন নারী দৌঁড়ে এসে একটি শিশুকে তার পেটের সাথে জড়িয়ে ধরল এবং তাকে দুধ পান করালো, তখন (মহানবি সা.) তাঁর সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মনে কর যে, এ মহিলা তার সন্তানটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সাহাবিগণ উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ! কখনই না। তখন মহানবি (সা.) বললেন, 'এ মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটুকু স্নেহশীল ও দয়ালু, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়েও বেশি দয়ালু।' (বুখারি ও মুসলিম।)

আল্লাহ আযিযুন (اَللّٰهُ عَزِيْزٌ)

আযিযুন অর্থ প্রবল পরাক্রমশালী। মহান আল্লাহ সকল শক্তির অধিকারী। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁর ক্ষতি করতে পারে না। কোনো ক্ষমতাশীল তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২০)

আল্লাহ রায্যাকুন (اَللّٰهُ رَزَّاقٌ)

রায্যাকুন অর্থ রিযিকদাতা। মহান আল্লাহ হলেন রিযিকদাতা। রিযিক অর্থ জীবিকা, জীবন উপকরণ ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের সকল প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বে-হিসাব রিযিক দান করেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

অর্থ: 'ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর।' (সূরা হুদ, আয়াত: ৬)

আল্লাহ আলিমুন (اَللّٰهُ عَلِيْمٌ)

আলিমুন অর্থ সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ যিনি সবকিছু জানেন বা যিনি সকল জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা হলেন সকল জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জ্ঞান অসীম যা পরিমাপ করা যায় না। কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি আসমান-জমিনসহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। আমাদের সকল কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি জানেন। এমনকি আমাদের অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কেও তিনি জানেন। আমরা যা কল্পনা করি বা স্বপ্ন দেখি সেগুলোও তাঁর জানার বাইরে নয়। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৪)

আল্লাহ হাকিমুন (اَللّٰهُ حَكِيْمٌ)

হাকিমুন অর্থ প্রজ্ঞাময়, সুবিজ্ঞ ও সুনিপুণ কর্মদক্ষ। আল্লাহ তা'আলা হলেন প্রজ্ঞাময়, মহান হিকমতের অধিকারী। এ মহাবিশ্ব তিনি সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং মহাপ্রজ্ঞা ও সুদক্ষ কর্মকৌশলের সঙ্গে পরিচালনাও করছেন। আমাদের চারপাশে যে দিকেই তাকাই সর্বত্রই মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা ও সুনিপুণ কর্মকৌশল দেখতে পাই। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ বলেন, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না; তুমি আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?' (সূরা আল-মুল্‌ক, আয়াত: ৩)

দলগত আলোচনা ও উপস্থাপন

কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করো এবং আলোচনা শেষে উপস্থাপন করো।

আলোচনার বিষয়বস্তু: আল্লাহর সৃষ্টির মাঝেই তাঁর পরিচয় নিহিত– এটি আমরা কীভাবে বুঝতে পারি?

তাওহিদের শিক্ষা

আকাইদের সর্বপ্রথম ও প্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদ অর্থ আল্লাহ তা'আলাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। তাওহিদ থেকে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষা লাভ করতে পারি:

১. আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করব, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করব না।
২. আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর সবকিছু তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য আমরা সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

৩. আল্লাহ তা'আলা বিপদ-আপদ থেকে একমাত্র মুক্তিদাতা। সুতরাং বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা সব সময় আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করব।
৪. আমরা আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ জানব ও সেই সব নামে তাঁকে ডাকব এবং আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করব।
৫. আল্লাহ তা'আলা আমাদের সব সময় দেখছেন এবং আমাদের সকল কাজের হিসাব রাখছেন। সুতরাং আমরা সর্বদা ভালো কাজ করব এবং অন্যায়, অত্যাচার ও সর্বপ্রকার পাপ কাজ থেকে দূরে থাকব।

আচ্ছা, এতসব তুমি কেন পড়ছ বা শিখছ নিশ্চয়ই মনে আছে। তোমাদের একটা দেয়াল পত্রিকা তৈরি করতে হবে, তাই না? এতক্ষণ আমরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে কয়েকটি বিষয় জানলাম। তোমরা যে একটি বড় তালিকা তৈরি করেছিলে সেটির কথা মনে আছে? বইয়ে আকাইদ আর তাওহিদ সম্পর্কে যা যা লেখা আছে বা শিক্ষক তোমাদের যা যা শেখালেন, সেগুলোর কোনো কিছু সম্পর্কে কি তোমাদের তালিকায় ছিল? মিলিয়ে দেখো তো।

বাড়ির কাজ

তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তির জীবন ও কর্মে কি কি পরিবর্তন আসতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

এবার আমরা জানব রিসালাত সম্পর্কে।

রিসালাত (اَلرِّسَالَةُ)

রিসালাত এর ধারণা ও তাৎপর্য

রিসালাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বার্তা, চিঠি, সংবাদ বহন বা কোনো শুভ কাজের দায়িত্ব বহন করা। ইসলামের পরিভাষায় রিসালাত বলতে মহান আল্লাহর বাণী ও বিধিবিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে বোঝায়। আর আল্লাহ তা'আলা যাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব প্রদান করেন, তাঁকে বলা হয় রাসুল।

রিসালাত-এর প্রায় সমার্থক আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে নবুওয়াত। নবুওয়াত অর্থ অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান। মহান আল্লাহ কর্তৃক রাসুলগণকে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রদান করা হয়েছে তার নাম রিসালাত। আর নবিগণ যে বার্তা লাভ করেন তাকে বলে নবুওয়াত। নবি-রাসুলদের সবাই মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ও প্রেরিত। এ ক্ষেত্রে তাঁদের পরিচয়গত বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে– নবিদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিতাব প্রদান করেননি বরং মৌখিক নির্দেশ প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে রাসুলদের প্রতি তিনি মৌখিক নির্দেশের সাথে সাথে আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, নবুওয়াত ও রিসালাত একমাত্র মহান আল্লাহর দান। কোনো চেষ্টা সাধনার দ্বারা তা লাভ করা যায় না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

'আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষদের মধ্য থেকেও; আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।' (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৫)

মানব জাতির হেদায়াত ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য রিসালাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রিসালাতের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর এককত্ব এবং পরিচয় জানতে পেরেছে। এর মাধ্যমেই সে স্রষ্টার প্রতি অন্য মানুষের প্রতি এবং জীব-জগতের প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা এসেছে রিসালাতের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের পক্ষে যা বোঝা সম্ভব নয়, নবি ও রাসুলগণ তা মানুষকে সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রিসালাতের কল্যাণেই মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়েছে। তাই নবি-রাসুলদের প্রচারিত জীবনব্যবস্থাকে ধারণ করা, তাঁদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস আনা, তাঁদের দেখানো পথে চলা এবং সমাজে তা বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করা আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নবি-রাসুলগণের পরিচয়

নবি-রাসুলগণ ছিলেন সৃষ্টির সেরা মানুষ। তাঁরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং প্রেরিত দূত। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে তাঁদেরকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী। তাঁরা তাঁদের ওপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আজীবন নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁরা মানুষকে অসুন্দর, অন্যায়, অপরাধ ও মন্দ কাজের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং সুন্দর, ন্যায়, পরোপকার, কল্যাণকামিতা ও সৎ কাজের শুভ পরিণতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের উন্নত চরিত্রে সকল মানবীয় গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছে। তাঁরা ছিলেন মাসুম বা নিষ্পাপ। তাঁরা সবসময় নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণ সাধনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদের মধ্য থেকে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা অনেক। একমতে, তাঁদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। এর মধ্যে মাত্র ৩১৩ জন ছিলেন রাসুল। নবি-রাসুলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন হযরত আদম (আ.)-যিনি ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানব। আর সর্বশেষ হলেন– আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

নবি-রাসুলের পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা যাঁদের প্রতি আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন কিংবা নতুন শরিয়ত প্রদান করেছেন, তাঁরা হলেন রাসুল। আর যাঁর প্রতি কোনো কিতাব নাযিল হয়নি কিংবা যাঁকে কোনো নতুন শরিয়ত দেওয়া হয়নি তিনি হলেন নবি। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত প্রচার করতেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক রাসুলই নবি কিন্তু প্রত্যেক নবিই রাসুল নন।

নবি-রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

নবি-রাসুলগণকে মহান আল্লাহ নিরর্থক প্রেরণ করেননি; বরং দুনিয়াতে তাঁদেরকে প্রেরণ মানুষের প্রতি তাঁর এক বিশেষ অনুগ্রহ। মূলত নানা কারণে নবি-রাসুল প্রেরণ অপরিহার্য ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম হলো–

- মানুষ আল্লাহ তা'আলার পরিচয় জানতো না। নবি-রাসুল ছাড়া কেবল মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে তাঁর পরিচয় জানাও সম্ভব ছিল না। এ জন্য মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহক হিসেবে যুগে যুগে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে সৃষ্টির সর্বোত্তম মানুষদের নবি-রাসুল হিসেবে মনোনীত করে দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠিয়ে তাঁর পরিচয় প্রদান করেছেন। তাছাড়া মানুষ জানতো না, কোন পথে তাদের কল্যাণ, মুক্তি ও শান্তি নিহিত আছে। নবি-রাসুলগণই এ পথভ্রষ্ট মানুষদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তাঁরাই মানুষদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদেরকে চিন্তায় কর্মে ও আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করেছেন।

- নবি-রাসুলগণ ভালো ও সৎকর্মের শুভ পরিণতির জন্য সুসংবাদদাতা ও খারাপ কাজের পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা মানুষের পরকালীন জীবন সম্পর্কে যেমন অবহিত করেছেন তেমনি আবার কীভাবে মানুষের দুনিয়ার জীবন সুন্দর ও কল্যাণকর হবে তারও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা নবি-রাসুল প্রেরণ না করলে মানব সভ্যতার উন্নয়ন ঘটতো না।

- আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। দুনিয়াতে নবি-রাসুল না পাঠিয়ে এবং মানুষকে আখিরাতের জীবন সম্পর্কে সতর্ক না করে তাদের অন্যায় ও পাপ কাজের জন্য পরকালে শাস্তি দেওয়া তাঁর অভিপ্রায় নয়। এ জন্য তিনি যুগে যুগে সতর্ককারী হিসেবে নবি-রাসুলগণকে এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ হলো, নবি-রাসুলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন বা তাঁরা আল্লাহর যে বাণী আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। তাওহিদে বিশ্বাসের পরই রিসালাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। রিসালাত তথা নবি-রাসুলগণকে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা নবি-রাসুলগণই আমাদেরকে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস না করলে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বাণীকে অস্বীকার করা হয়। তাই রিসালাতে বিশ্বাস তাওহিদে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করে। রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অপরিহার্য একটি অঙ্গ।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাত

নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হলেন সর্বশেষ। তিনি একাধারে নবি ও রাসুল। কারণ তিনি নতুন শরিয়ত ও কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁকে প্রদত্ত দ্বীন বা জীবনবিধানের নাম 'ইসলাম' এবং

তাঁর ওপর অবতীর্ণ আসমানি কিতাবের নাম 'আল কুরআন'। তিনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে এ পৃথিবীতে আগমন করেন এবং ৪০ বছর বয়সে অর্থাৎ ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। তাঁর পূর্বের রাসুল হযরত ঈসা (আ.)-এর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের সময়কাল থেকে তাঁর নবুওয়াত লাভের মাঝে সময়ের ব্যবধান ছিল ৫০০ বছরের বেশি। এ দীর্ঘ সময় ধরে কোনো নবি-রাসুলের আগমন না ঘটায় সারা পৃথিবীর মানুষ তখন পথভ্রষ্টতা, অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার ও পাপাচারের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। এ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে জগৎসমূহের রহমত ও বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হিসেবে প্রেরণ করেন।

মানবতার কল্যাণের জন্য জগতে যত নবি-রাসুল এসেছিলেন তাঁরা কেবল কোনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্ববিষয়ে ও সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। অন্য নবি-রাসুলগণ কোনো বিশেষ অঞ্চল বা বিশেষ সময়ের জন্য প্রেরিত; কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সকল দেশ, জাতি এবং সর্বকালের জন্য প্রেরিত। তাই তিনি হলেন বিশ্বনবি। তাঁর শরিয়ত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। মহানবি (সা.) এর রিসালাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই তাঁর রাসুলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করবার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা আল-ফাত্হ, আয়াত: ২৮)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবি। তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবি-রাসুল আগমনের ধারা বন্ধ হয়েছে। তাঁর পরে আর কোনো নবি-রাসুল এ দুনিয়াতে আসবেন না। এ জন্য তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁকে শেষ নবি আখ্যা দিয়ে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ
اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۧ

অর্থ: 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০)

আমরা সকল নবি-রাসুলের প্রতি ইমান আনবো এবং আমাদের নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দেখানো পথে আমাদের জীবন পরিচালনা করব।

বই এবং শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার পর তুমি নিজের মতো করে গুছিয়ে রিসালাত সম্পর্কে যা যা জানলে তা বন্ধুদের সামনে উপস্থাপন করবে। তোমার অন্য সব বন্ধুরাও উপস্থাপন করবে। সবার উপস্থাপন থেকে আরও ভালোভাবে বিষয়টি সম্পর্কে বুঝতে পারবে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন

রিসালাত সম্পর্কে একটি এক পাতার প্রতিবেদন তৈরি করে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

এবার আমরা জেনে নেবো আকাইদের আরেকটি মৌলিক বিষয়– আখিরাত সম্পর্কে।

আখিরাত (اَلْاٰخِرَةُ)

আখিরাত-এর ধারণা

আখিরাত আরবি শব্দ। এর অর্থ পরকাল, পরজীবন, মরণোত্তর বা শেষ জীবন। ইসলামের পরিভাষায় আখিরাত বলতে মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বোঝায়।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে আখিরাতের জীবনকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের নাম হলো 'বারযাখ' (بَرْزَخٌ) বা কবরের জীবন, যা মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় পর্যায় হলো, কিয়ামত থেকে অনন্তকাল অবধি।

মহান আল্লাহর নির্দেশে শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে জগতের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর যখন আল্লাহর ইচ্ছা হবে তখন তিনি আবার সকলকে জীবিত করবেন। সকলে পুনরুত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এরপর দুনিয়ার সকল কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। জান্নাত কিংবা জাহান্নামে প্রবেশের মাধ্যমে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করবে। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের এ পর্যায় বা স্তরসমূহকে বলা হয় আখিরাত।

আখিরাতে বিশ্বাস বলতে বোঝায়, এ দুনিয়ার জীবনই মানুষের জন্য শেষ নয়, দুনিয়ার জীবনের কর্মফল বা প্রতিদান ভোগ করার জন্য পরকালের জীবন রয়েছে, যা হবে অনন্তকাল, এ ধারণাটিতে বিশ্বাস করা। আখিরাতে বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক আকিদাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

অর্থ: 'আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪)

তাৎপর্য

আখিরাতের জীবন অনন্তকালের। এ জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। আখিরাতের তুলনায় মানুষের দুনিয়ার জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী। মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ৩৯)

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের দুনিয়ার জীবনের শুরু হয়। আর মৃত্যুর মাধ্যমে এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহজীবনের কর্মের জন্য মানুষকে তার মৃত্যু-পরবর্তী আখিরাত জীবনে জবাবদিহি করতে হবে। দুনিয়ার জীবনে যারা ভালো কাজ করবে, আখিরাতের জীবনে তারা তার সুফল ভোগ করবে।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম একটি মৌলিক বিষয়। তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের সাথে সাথে আখিরাতের জীবনকেও সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকার করা জরুরি। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬)

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের দুনিয়ার জীবনের সকল কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ, আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আখিরাতে তার সকল কাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই জবাবদিহিতার ভয়ে সে তার কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্ক থাকে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। আবার সে বিশ্বাস করে যে দুনিয়ার সকল ভাল কাজের পুরস্কার আখিরাতে পাওয়া যাবে। তাই সে ভাল কাজে আগ্রহী হয় এবং মন্দ কাজ পরিহার করে চলে। এ ভাবে আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলে।

সর্বোপরি, আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে মানুষের ইহকাল ও পরকালের জীবন সুন্দর, সফল, সার্থক ও শান্তিপূর্ণ হয়। তাই আমরা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস করব।

নিজে করি

আখিরাত বিষয়ক পাঠ থেকে আমাদের জীবনে করণীয় ও বর্জনীয়–

করণীয়	বর্জনীয়
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

আখিরাতের জীবনের স্তরসমূহ

মৃত্যু (اَلْمَوْتُ)

মৃত্যুর মাধ্যমে আখিরাতের জীবন শুরু হয়। মৃত্যুকে আরবিতে বলা হয় 'মাউত'। জীবন যেমন মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি মৃত্যুও মহান রাব্বুল আলামিনের নির্দেশেই হয়ে থাকে। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।' (সূরা আল-মুল্‌ক, আয়াত: ২)

মৃত্যু থেকে কারও বাঁচার কোনো উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ

অর্থ: 'জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।' (সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত: ১৮৫)

কবর বা বারযাখ (بَرْزَخٌ)

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে কবর বা বারযাখের জীবন বলা হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

অর্থ: 'আর তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।' (সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ১০০)

কবর বা বারযাখ জীবনে মুনকার ও নাকীর নামে দুজন ফেরেশতা তিনটি প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলো হলো-

১. তোমার রব কে?
২. তোমার দ্বীন কী?
৩. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হবে, এ ব্যক্তি কে?

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশমতো চলে তারা এ প্রশ্নসমূহের সঠিক জবাব দিতে পারবে। তারা বলবে, আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন এবং ইনি মুহাম্মাদ (সা.) আমার নবি। এরপর তাদের কবর হবে জান্নাতের মতো সুখের স্থান। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশমতো চলে না, তারা উত্তর দিতে পারবে না। তাদের কবর হবে অত্যন্ত কষ্টের জায়গা।

কিয়ামত (اَلْقِيَامَةُ)

কিয়ামত আখিরাত জীবনের একটি স্তর। ইসলামি বিশ্বাস মোতাবেক কিয়ামতের দুটি অবস্থা রয়েছে। আর তা হলো– মহাপ্রলয় এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে হাশরের ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়া।

আল্লাহ এ বিশ্বজগতের সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ ও জিন জাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করার জন্য। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যাবে। তাঁর নাম নেওয়ার

মতো আর কেউ থাকবে না। তখন মহান আল্লাহ এ বিশ্বজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। মহান আল্লাহর হুকুমে নির্দিষ্ট সময়ে হযরত ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। এর ফলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশ্বজগতের এ ধ্বংসের নাম কিয়ামত। একে মহাপ্রলয়ও বলা হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ

অর্থ: 'আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল।' (সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৮)

এ মহাবিশ্বের সবকিছু ধ্বংসের বহু সময় পরে আবার আল্লাহর হুকুমে হযরত ইসরাফিল (আ.)-এর দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে মানুষ কবর থেকে এবং যে যেখানে থাকবে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবে। এ উত্থানকে কিয়ামত বলা হয়। একে পুনরুত্থান দিবসও বলা হয়। কিয়ামতের এ দু'টি অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।' (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৮)

হাশর (اَلْحَشْرُ)

হাশর শব্দের অর্থ মহাসমাবেশ বা একত্রিত হওয়া। পুনরুত্থানের পর ভীত-শঙ্কিত জিন ও মানুষ একজন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত হবে। ইসলামের পরিভাষায় এর নাম হাশর বা মহাসমাবেশ। মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۙ

অর্থ: 'সে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।' (সূরা আন-নাবা, আয়াত: ১৮)

মানুষ যে ময়দানে একত্রিত হবে ওই স্থানটিকে 'হাশরের ময়দান' বা পুনরুত্থানের ময়দান নামে আখ্যায়িত করা হয়। সেখানে মানুষ ও জিন জাতির কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে এবং বিচারকার্য সমাধা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা হবেন বিচারক আর সাক্ষী হবেন নবি-রাসুল ও ফেরেশতাগণ।

হাশরের ময়দানে মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে। পুণ্যবানেরা ডান হাতে এবং পাপিরা বাম হাতে আমলনামা পাবে। হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের সকল কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে- যিনি এক পরাক্রমশালী।' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪৮)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন 'এটা (পুনরুত্থান) এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৫১)

মীযান (اَلْمِيْزَانُ)

মীযান শব্দের অর্থ মানদণ্ড বা ওজন পরিমাপক। হাশরের দিন মানুষ ও জিনের পাপ-পুণ্যের ওজন করা হবে। আর যে পরিমাপক দ্বারা হাশরের দিন পাপ-পুণ্যের ওজন করা হবে তাকে ইসলামি পরিভাষায় মীযান বলা হয়। ভালো হোক, মন্দ হোক, মানুষের আমল তিল পরিমাণ ওজনের হলেও আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন তা উপস্থাপন করবেন এবং মীযানে তা ওজন করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি সরিষা পরিমাণ হয়, তবুও আমি তা উপস্থিত করব।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৪৭)

মীযানে যাঁদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে, তাঁরা হবেন জান্নাতের অধিবাসী। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা হবে জাহান্নামি। মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।' (সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ১০২-১০৩)

মীযানে পুণ্যের পাল্লা ভারী করার জন্য আমাদের মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলতে হবে এবং বেশি বেশি পুণ্যের কাজ করতে হবে।

সিরাত (اَلصِّرَاطُ)

সিরাত অর্থ পথ, রাস্তা, পুল ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সিরাত এমন একটি পুল যা কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত হবে। হাশরের ময়দানে বিচারকাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সকল মানুষকে এ সিরাত অতিক্রম করতে হবে। সিরাত চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষা অধিক ধারালো হবে। (মুসলিম)

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বপ্রথম এ সিরাত অতিক্রম করবেন। ইমানদার তথা জান্নাতিগণ সিরাতের ওপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। ইমানদারদের আমল অনুসারে সিরাত নানারকম হবে। কারও জন্য সিরাত হবে বিশাল মাঠের মতো। নিজ নিজ নেক আমল অনুসারে ইমানদারগণ অতি সহজে সিরাত অতিক্রম করতে থাকবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, আবার কেউ দ্রুত কদমে সিরাত অতিক্রম করবেন।

আর যারা জাহান্নামি হবে তারা সিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। তারা তা অতিক্রম করতে গিয়ে জাহান্নামে নিপতিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা (সিরাত) অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। তারপর আমি মুত্তাকিদেরকে উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব। (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭১-৭২)

জান্নাত (اَلْجَنَّةُ)

জান্নাত আরবি শব্দ। এর অর্থ উদ্যান বা বাগান। অভিধানে 'জান্নাত' এমন বাগানকে বলা হয় যার রয়েছে ঘন বৃক্ষরাজি। ফারসি ভাষায় জান্নাতকে 'বেহেশত' বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায়, দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের পর পুণ্যবান মু'মিনদের জন্য পরকালে আল্লাহ তা'আলা যে অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী আরামদায়ক স্থান তৈরি করে

রেখেছেন, তার নাম জান্নাত। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৪)

জান্নাত পরম সুখ-শান্তির স্থান। সেখানে রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু বা কোনো অশান্তি নেই। জান্নাতে আছে আরামের সব রকম ব্যবস্থা। সেখানকার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। মন যা চাইবে সেখানে তা পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো। এটি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন।' (সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত : ৩১-৩২)

জান্নাতের স্তর: আল-কুরআন ও হাদিসে জান্নাতের আটটি স্তরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো-

১. জান্নাতুল ফিরদাউস	৫. জান্নাতুন নাঈম
২. জান্নাতুল মা'ওয়া	৬. জান্নাতু আদ্‌ন
৩. দারুল মাকাম	৭. দারুল খুল্‌দ
৪. দারুল ক্বারার	৮. দারুস্ সালাম

জাহান্নাম (جَهَنَّمُ)

জাহান্নাম অর্থ আগুনের গর্ত, দোযখ, শাস্তির স্থান। ইসলামি পরিভাষায়, হাশরের ময়দানে বিচারের পর পাপীদের যে স্থানে শাস্তির জন্য প্রেরণ করা হবে, তাই জাহান্নাম।

যারা আল্লাহ, রাসুল ও ইমানের অন্য মৌলিক বিষয়গুলোকে অস্বীকার করবে এবং বিভিন্ন অন্যায় ও পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিপতিত করা হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'তবে যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাস।' (সূরা আন-নাযি'আত, আয়াত : ৩৭-৩৯)

জাহান্নামে দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। সেখানে আছে ভীষণ শাস্তি। সেখানে রয়েছে প্রজ্বলিত আগুন, যা শরীরের মাংস হাড় থেকে পৃথক করে দেবে। আবার সৃষ্টি হবে নতুন মাংস ও চামড়া। এভাবে পাপীরা জাহান্নামে অনন্তকাল ধরে আগুনে পুড়তে থাকবে। জাহান্নামের আগুনের দহন ক্ষমতা দুনিয়ার আগুনের দহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের নবি কারীম (সা.) বলেন, 'তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।' (বুখারি) জাহান্নামে আগুন ছাড়াও নানা রকম শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

জাহান্নামের স্তর: অবিশ্বাসী ও পাপীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ সাতটি জাহান্নাম প্রস্তুত করে

রেখেছেন। এগুলো হলো–

১. জাহান্নাম	২. লাযা
৩. হুতামাহ	৪. সাঈর
৫. সাকার	৬. জাহীম
৭. হাবিয়া	

আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব

ধর্মের মূল চেতনা হলো বিশ্বাস– যা মানব জীবনের মূল চালিকাশক্তি। ইসলামি জীবন দর্শনে বিশ্বাসের অন্যতম মৌলিক বিষয় তিনটি। এগুলো হলো– তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, রিসালাত তথা নবি-রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস এবং আখিরাত অর্থাৎ পরকালের প্রতি বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস ইমানের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ইহজীবনে যে ভালো কাজ করবে আখিরাতে তার জন্য পুরস্কার থাকবে। আবার ইহজীবনে যে খারাপ কাজ করবে আখিরাতে তার জন্য শাস্তি অপেক্ষা করছে। তাই আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সৎকর্মশীল ও দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তোলে। আখিরাতের স্বার্থে সে দুনিয়ায় ভালো কাজ করতে উৎসাহী হয় এবং খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। মহান আল্লাহ বলেন, 'পক্ষান্তরে যে তার প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।' (সূরা আন-নাযি'আত, আয়াত: ৪০-৪১)

সর্বোপরি, আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মের অনুপ্রেরণা জোগায়। আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিপদে ধৈর্যশীল হয় এবং অল্পে তুষ্ট থাকে। এছাড়া আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অশ্লীল কাজকর্ম– এককথায় সকল মন্দ কাজ ও পাপাচার থেকে রক্ষা করে তাঁর চরিত্রকে পবিত্র রাখে। এর ফলে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সুন্দর, সফল, সার্থক ও শান্তিপূর্ণ হয়। তাই আমরা আখিরাত জীবনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখব এবং উন্নত চরিত্র গঠন করব।

নৈতিক চরিত্র গঠনে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা

নৈতিক চরিত্র গঠনে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি, ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম আকাইদ। আকাইদের মৌলিক বিষয় তিনটি। যথা– তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত। নৈতিক চরিত্র বলতে বোঝায় কথা ও কাজে উত্তম রীতি-নীতির অনুশীলন, মার্জিত ও বিনয়ী হওয়া, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া, সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি। দুর্নীতি, অন্যায়, অশ্লীল, অশালীন ও পাপকর্মসমূহ পরিত্যাগ করা এবং অন্য ধর্মের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করাও নৈতিক চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিক চরিত্র মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। চরিত্রহীন মানুষের নীতিবোধ থাকে না। সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে

পারে। ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ কোনো কিছুরই সে পরোয়া করে না। সে শুধু নিজের লাভ ও কল্যাণই বোঝে। নীতিহীন মানুষও ঠিক তেমনি। সে কোনোরূপ আইন-কানুন, বিধি-বিধান মানতে চায় না। সে নৈতিক আচরণ প্রদর্শনে যত্নবান নয়; বরং নিজের লাভের জন্য সে অপরের ক্ষতিসাধন করে থাকে। মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা দেওয়া, পরচর্চা ইত্যাদি আচরণ তার চরিত্রে ফুটে ওঠে। সমাজে সে নানারূপ অশান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। কোনো মানুষ তাকে ভালোবাসে না।

অন্যদিকে নৈতিকতা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। নৈতিক চরিত্রবান মানুষ সমাজে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে। সকলেই তাঁকে সম্মান করে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সমাজের লোকজন সবাই তার ওপর আস্থা রাখে।

তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের সাথে নৈতিক চরিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ইসলামের এই বিশ্বাসসমূহ মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি আকাইদের এই বিষয়গুলো বিশ্বাস করে, তার চরিত্র সুন্দর হয়। সে সবসময় নীতি ও উত্তম আদর্শের অনুসরণ করে। অন্যায়-অত্যাচার, অশ্লীলতা থেকে সে সর্বদা দূরে থাকে। সে কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না; বরং সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়।

তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো অনৈতিক কাজ করতে পারে না। কারণ, সে জানে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সর্বদা দেখছেন এবং তার সকল কাজের হিসাব রাখছেন। সুতরাং সে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার হুকুমমতো জীবনযাপন করে। অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে।

আবার রিসালাতে বিশ্বাসী মানুষ নবি-রাসূলগণের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাঁদের মতো সে-ও উত্তম চরিত্র অনুশীলন করে। উদ্ধত ও অশালীন চলাফেরা, অনৈতিক আচার-আচরণ ও অশ্লীল কথাবার্তা তার থেকে কখনো প্রকাশ পায় না।

এমনিভাবে আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ জানে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে সব সময় দেখছেন ও তার সব কথা শুনছেন এবং হাশরের ময়দানে তাকে তার সকল কর্মের হিসাব দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তা-ও সে দেখবে।" (সূরা আল-যিলযাল, আয়াত: ৭-৮)

যে দুনিয়াতে ভালো ও নেক কাজ করবে, সে আখিরাতে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আর দুনিয়ায় যে অন্যায় ও পাপ কাজ করবে আখিরাতে সে চরম শাস্তির মুখোমুখি হবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করে। আখিরাতের সফলতা ও শান্তির আশায় মানুষ ভালো কাজ করে, সকলের সাথে মিলেমিশে চলে এবং উত্তম চরিত্রবান হয়। অন্যদিকে আখিরাতের শাস্তির ভয়ে মানুষ মন্দ ও অশ্লীল কাজ পরিত্যাগ করে। অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। এভাবে মানুষ আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে নৈতিকতা অনুশীলন করে থাকে।

অতএব, নৈতিক চরিত্র গঠনে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা দৃঢ়ভাবে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করব। আমাদের জীবনে নৈতিকতার অনুশীলন করব, অনৈতিক কাজ থেকে সব সময় দূরে থাকব। তাহলেই আমরা ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করতে পারব।

মুক্ত আলোচনা এবং দেয়াল পত্রিকা তৈরি

এতক্ষণে তুমি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক ধারণা পেয়ে গেছ! আশা করি সবকিছু বুঝতেও পেরেছ। এই যে এতকিছু তুমি এখন জানো এই সবকিছু কি তোমাদের তৈরি করা সেই তালিকায় ছিল? যদি না থেকে থাকে, তাহলে দেখো, আরও কত তথ্য পেয়ে গেলে এখন তোমরা। এই সব তথ্য নিয়ে এখন কাজটা কি মনে আছে? দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা, তাই না? এখন তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে দেয়াল পত্রিকায় লেখার জন্য অনেক কিছু আছে। ঝটপট লিখে ফেলো সেই সবকিছু আর তোমাদের শিক্ষককে দেখিয়ে কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করে নাও! বন্ধুদের সঙ্গেও আলোচনা করে নাও যাতে সবাই একই লেখা লিখে না ফেলে। একই সঙ্গে তোমরা সবাই মিলে তোমাদের দেয়াল পত্রিকাটির ডিজাইন কেমন হবে, কাগজ কী হবে, কোন কোন রঙে লেখা হবে সেই সবকিছুও ঠিক করে ফেলো।

মানে দেয়াল পত্রিকা তৈরির কাজের ৪ এবং ৫ নম্বর ধাপের কাজগুলো করে ফেলো! আর সবাই মিলে শিক্ষকের সহায়তায় নিজেদের কাজগুলো ভাগ করে ভালোভাবে বুঝে নাও। আর কিন্তু বেশি সময় নেই! দেয়াল পত্রিকা তৈরি করে সবার সামনে উপস্থাপন করতে হবে তো!

দেয়াল পত্রিকার এই সব লেখালেখির কাজ করতে গিয়ে কোথাও কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই শিক্ষকের সহায়তা নেবে। শিক্ষকও তোমাদের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয় বা বিশ্বাসের ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। তার আলোচনাগুলোও মন দিয়ে শুনবে। সেখান থেকেও হয়তো তোমরা দেয়াল পত্রিকায় লেখার মতো কিছু পেয়ে যেতে পারো!

আর শুধু দেয়াল পত্রিকা তৈরি করলেই হবে না, একটা বড় অনুষ্ঠান করে দেয়াল পত্রিকাটি উদ্বোধনও করতে হবে। তাহলে, সেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিতে হবে না? অনুষ্ঠানে কাদেরকে দাওয়াত করবে তা-ও ঠিক করে নিতে হবে। আর দাওয়াতের জন্য কার্ডও বানাতে হবে।

তাহলে এখন তোমাদের কাজগুলো হলো–

কাজ-৭ (দেয়াল পত্রিকার মূল কাজ)

১. দেয়াল পত্রিকার জন্য লেখা ঠিক করা এবং শিক্ষককে দেখিয়ে লেখার ভুল সংশোধন করা।

২. দেয়াল পত্রিকাটি বানিয়ে ফেলা।

৩. দাওয়াত কার্ড বানিয়ে সেটি বিতরণের মাধ্যমে দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে দাওয়াত দেওয়া।

৪. দেয়াল পত্রিকার উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি কীভাবে চলবে (অনুষ্ঠানসূচি) তা ঠিক করা এবং অনুষ্ঠানে কে কোন কাজ করবে তা ঠিক করা।

৫. অনুষ্ঠানসূচি অনুসারে যার যে কাজ তা ঠিকভাবে করার প্রস্তুতি নেওয়া।

দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন

একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতিথিদের উপস্থিতিতে দেয়ালপত্রিকাটি উদ্বোধন করা হবে। এ সময় দেয়াল পত্রিকার কোন কাজটি তোমরা করেছ তা সবাইকে জানাবে। অথবা, তোমাদেরকে যদি অনুষ্ঠানে বিশেষ কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় সেটি পালন করবে। দেয়াল পত্রিকা দেখে কে কী বলছে সেগুলোর নোট নেওয়ার চেষ্টা করবে। এটি তোমাদেরকে পরে অনেক সাহায্য করবে।

অন্যকে জানানো

দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়ে গেলে তোমরা শিক্ষকের সাথে বসে অনুষ্ঠানে কী কী হলো তা নিয়ে আলোচনা করবে। তোমাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে যদি তুমি আরও জানতে চাও তাহলে এ সময় শিক্ষককে জিজ্ঞেস করবে। শিক্ষক তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি হয়তো তোমাদের আরও তথ্য কোথা থেকে পেতে পারো তা-ও জানিয়ে দেবেন।

এবার তোমাকে একটু বাড়ির কাজ করতে হবে। কাজটা হলো–

কাজ- ৮ (বাড়ির কাজ)

দেয়াল পত্রিকা তৈরি এবং উদ্বোধনের এই পুরো অভিজ্ঞতাটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

প্রতিবেদনে থাকবে–

১. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে তুমি কী জানো?

২. কেন ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন?

৩. দেয়াল পত্রিকা তৈরির এই কাজটি থেকে তুমি কী কী শিখলে?

বাড়ির কাজটি করে এনে সেখানে তোমাদের শিক্ষকের স্বাক্ষর বা সাইন নেবে। কারণ, তারপর তোমাদের আর একটি ছোট্ট কাজ করতে হবে। শিক্ষকের স্বাক্ষর করা এই প্রতিবেদনটি নিয়ে গিয়ে এবার তোমাকে কী করতে হবে জানো? এবার তুমি তোমার থেকে বয়সে ছোট কাউকে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কী তা শেখাবে বা বোঝানোর চেষ্টা করবে। পারবে না? কঠিন মনে হলেও কাজটা আসলে ততটা কঠিন না। একবার চেষ্টা করেই দেখো।

এই কাজটি করার মাধ্যমেই আমাদের ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের কাজটি শেষ হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

প্রিয় শিক্ষার্থী,

আমরা এ অধ্যায়ে ইসলামের মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কে জানব। ইসলামে কি কি ইবাদাত রয়েছে এবং সেগুলো করার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কী তা জেনে নিয়ে আমরা নিয়ম মেনে সে ইবাদাতগুলো পালন করতে চেষ্টা করব। আগের অধ্যায়ের মতো এ অধ্যায়েও তুমি একা বা বন্ধুরা মিলে আনন্দের সাথে এ সকল ইবাদাত পালন করবে। সেই সঙ্গে শিক্ষকও তোমাদের কিছু অনুশীলন করাবেন। এসব কাজ করতে করতেই তুমি ইসলামের মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কে শিখে যাবে। তাহলে শুরু করা যাক।

ইবাদাত সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা

ইবাদাত করতে হলে শুরুতেই আমাদের জেনে নিতে হবে যে এ ইবাদাতগুলো কি কি আর কীভাবে এগুলো পালন করতে হয়। তাই এ অধ্যায়ের শুরুতেই শিক্ষক তোমাদের সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবেন। এ ছাড়া এ বইটি পড়েও তুমি ইসলামের বিভিন্ন ইবাদাত সম্পর্কে জানতে পারবে।

তাহলে, জেনে নেওয়া যাক।

ইবাদাত (اَلْعِبَادَةُ)

'ইবাদাত' আরবি শব্দ। এর অর্থ আনুগত্য করা। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই ইবাদাত। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি যেমন ইবাদাত, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধিবিধান মেনে পালন করাও ইবাদাত।

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের লালন-পালন করেন। আমাদের জীবন, মৃত্যু সবই তাঁর হাতে। তিনি আমাদের জন্য এ মহাবিশ্বকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। আকাশ-মাটি, চাঁদ-সূর্য, ফুল-ফল, নদী-নালা সবই তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা এসব উপভোগ করি। আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করার পর আমাদের এর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করতে হবে। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলার নামই ইবাদাত।

মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্য। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○

অর্থ: 'আর আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানুষকে ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তাই সব সময় তাঁর ইবাদাতে মশগুল থাকা মানুষের কর্তব্য। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সবসময় কি ইবাদাত করা সম্ভব? হ্যাঁ দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই ইবাদাত করা সম্ভব। যেমন- আমরা খেতে বসলে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করি, তাহলে যতক্ষণ খাওয়ার মধ্যে থাকবো, ততক্ষণ আল্লাহর রহমত পেতে থাকবো। এটিও একটি ইবাদাত। পড়ার সময় যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে পড়া শুরু করি, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত লেখাপড়া করব, ততক্ষণই তা ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে। একজন অন্ধলোক রাস্তা পার হতে পারছেন না, তাকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিলে তা-ও আল্লাহর নিকট ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে। এভাবে সব সময়ই আমরা ইবাদাত করতে পারি।

ইবাদাতের অংশ হিসেবে আমরা ভালো কাজ করতে পারি। অন্যকে ভালো কাজ করার পরামর্শ দিতে পারি। এতে উভয়ই সমান সওয়াব পাবো। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পরামর্শ বা সন্ধান দেবে, সে ঐ কাজটি সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব পাবে।' (মুসলিম)

ইবাদাত করলে আল্লাহ খুশি হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখময় হয়। পরকালে জান্নাত লাভ করা যায়। আমরা আল্লাহর ইবাদাত করব, আল্লাহর পথে জীবনকে পরিচালিত করব। তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারব।

ইবাদাতের প্রকারভেদ

ইবাদাতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ইবাদাতে বাদানি বা শারীরিক ইবাদাত: শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে ইবাদাত করা হয়, তা হলো ইবাদাতে বাদানি বা শারীরিক ইবাদাত। যেমন– দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ও রমযান মাসে রোযা রাখা।

২. ইবাদাতে মালি বা আর্থিক ইবাদাত: অর্থ বা সম্পদ দ্বারা যে ইবাদাত করা হয় তাকে বলা হয় ইবাদাতে মালি বা আর্থিক ইবাদাত। যেমন– যাকাত দেওয়া, সাদকা ও দান খয়রাত করা ইত্যাদি।

৩. ইবাদাতে বাদানি ও মালি বা শরীর ও অর্থ উভয়ের সংমিশ্রণে ইবাদাত: উল্লিখিত দুই প্রকার ইবাদাত ছাড়াও এমন কিছু ইবাদাত আছে যা শুধু শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কিংবা শুধু অর্থ দিয়ে সম্পন্ন করা যায় না; বরং শরীর এবং অর্থ উভয়ের প্রয়োজন হয়। যেমন– হজ করা।

একক কাজ, উপস্থাপন এবং আলোচনা

তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমরা ইবাদাত সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা লাভ করেছো। এখন তোমাদের প্রত্যেককে একটি কাজ করতে হবে। তাহলে এসো এবার দেখে নিই আমাদের কাজটি কী–

কাজ- ৯: (বাড়ির কাজ)

তোমার আশেপাশে কে কীভাবে ইবাদাত করে তা জেনে এসে তোমার বন্ধুদের এবং শিক্ষককে জানাও।

তোমাদের পরিবারে, এলাকায়, বাড়ির পাশের মসজিদে বা রাস্তায় তুমি নিশ্চয়ই প্রতিদিন অনেক মানুষকে অনেকভাবে ইবাদাত করতে দেখো। ইবাদাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে হয়তো তুমি এতদিন বুঝতে পারোনি যে তাঁরা ইবাদাত করছেন। এখন তো তুমি জানো যে কীভাবে ইবাদাত করা হয়। তাহলে এখন তুমি আবারও তোমাদের আশেপাশে একটু ভালোভাবে দেখো। প্রয়োজনে তোমার পরিবারের সদস্যদের, পাড়া-প্রতিবেশীদের বা বিদ্যালয়ের বাইরের অন্য বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। কে কীভাবে ইবাদাত করছে তা বুঝতে চেষ্টা করো এবং তোমার ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের বাড়ির কাজের খাতায় তা নোট করো।

নোট করা হয়ে গেলে এখন কী করবে? তুমি যা জেনেছ সেটা সবাইকে জানাতে হবে না? আর তোমার বন্ধুরা কে কী জানল সেটাও তো জানতে হবে, তাই না? তাহলে এবারের কাজ হলো–

কাজ- ১০: (বাড়ির কাজ)

তোমাদের জেনে আসা ইবাদাতের ধরনগুলো শ্রেণিতে সকলের সামনে উপস্থাপন করো।

উপস্থাপনার মাধ্যমে তুমি যা জেনেছ সেটি যেমন তোমার বন্ধুরা জানতে পারল, তেমনি তোমার বন্ধুদের জানাগুলোও তুমি জানতে পারলে। এভাবে সবাই সবার জেনে আসা ইবাদাতের ধরনগুলো সম্পর্কে জেনে গেলে!

এখন চেষ্টা করে দেখো তো, তোমরা সবাই যা জেনে এসেছ সেগুলোর কোনটি ইবাদাতের কোন প্রকারভেদের অন্তর্ভুক্ত, সেটি বের করতে পারো কিনা? এ কাজে প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নাও। তাহলে আমাদের এবারের কাজ হলো—

কাজ- ১১: (বাড়ির কাজ)

তোমাদের সকলের জেনে আসা ইবাদাতগুলোর কোনটি ইবাদাতের কোন প্রকারভেদের অন্তর্গত তা নির্ণয় করো।

কাজ- ১১ করতে গেলে তোমাদের কি কি করতে হবে, বলো তো? প্রথমেই তোমরা সবাই যা যা উপস্থাপন করেছ সেগুলোকে একত্রে লিখে ফেলতে হবে। তোমরা বন্ধুরা মিলে প্রথম অধ্যায়ের পাঠের সময় যেভাবে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করে পরে আবার সবাই একত্রে কাজ করেছিলে, এবারও সেভাবে কাজ করতে হবে। তাহলে তোমরা আশপাশের মানুষকে কীভাবে ইবাদাত করতে দেখছ সেগুলো একসঙ্গে লিখে ফেলো। তারপর কোন ইবাদাতটি ইবাদাতের কোন শ্রেণিবিভাগের অন্তর্গত সেটি পাশে লিখে ফেলো। কাজটি করতে গিয়ে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয়, বা কোথাও বুঝতে না পারো, তাহলে শিক্ষকের সহায়তা নাও।

আরও জানি

এবার শিক্ষক তোমাদের সামনে ইবাদাতের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তোমাদের কাজ হলো শিক্ষকের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনা, বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করা এবং শিক্ষক কোনো কাজ দিলে সেটি সঠিকভাবে করার চেষ্টা করা।

শিক্ষক যেসব বিষয়ে আলোচনা করবেন, সেগুলোই এখন এখানে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হবে, যাতে শিক্ষকের আলোচনার পাশাপাশি বই থেকে পড়েও বিষয়গুলো সম্পর্কে তুমি জানতে পারো।

তাহারাত (اَلطَّهَارَةُ)

'তাহারাত' আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্রতা। ইসলামি পরিভাষায় তাহারাত বলতে দেহ, মন, পোশাক, স্থান বা পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে বোঝায়। আল্লাহর ইবাদাত করার পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। ওযু, গোসল, তায়াম্মুম ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। ইবাদাতের জন্য পবিত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। পবিত্র না হয়ে সালাত আদায় করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল হয় না।' (মুসলিম)

পবিত্র থাকলে শরীর সুস্থ থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে। লেখাপড়া ও কাজকর্মে মন বসে। ভালো কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি তাঁর উম্মতকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন এবং পবিত্র থাকার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'পবিত্রতা ইমানের অংশ।' (মুসলিম)

তাহারাত বা পবিত্রতার প্রকারভেদ

পবিত্রতা দুই প্রকার:

১. বাহ্যিক পবিত্রতা
২. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা

বাহ্যিক পবিত্রতা: ইবাদাতের প্রস্তুতির জন্য শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ইবাদাতের স্থান পবিত্র করতে হয়। শারীরিক পবিত্রতা লাভের মাধ্যম হলো ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম। শরিয়তের বিধি অনুযায়ী ওযু, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনই বাহ্যিক পবিত্রতা।

অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা: দেহের পাশাপাশি মনকেও যাবতীয় পাপ চিন্তা থেকে মুক্ত করতে হয়। কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হয়। ভবিষ্যতে ভালো কাজ করার অঙ্গীকার এবং পাপ কাজ বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প করতে হয়। এতে দেহ ও মন পবিত্র হয় এবং আল্লাহর ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত হয়। এটাই অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা।

নাজাসাত (اَلنَّجَاسَةُ)

'নাজাসাত' আরবি শব্দ। এর অর্থ অপবিত্রতা। এটি তাহারাত বা পবিত্রতার বিপরীত। শরীর থেকে যেসব জিনিস বের হওয়ার কারণে শরীর অপবিত্র হয়ে যায় অথবা যে সব দ্রব্য কোনো পবিত্র বস্তুতে লাগলে তা অপবিত্র হয়ে যায়, তাকে নাজাসাত বা অপবিত্রতা বলা হয়। যেমন: মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি। নাজাসাতের কারণে শরীর, কাপড় ও ব্যবহারিক জিনিসপত্র অপবিত্র হয়ে যায়। এ অবস্থায় তা পবিত্র করা একান্ত জরুরি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

অর্থ: 'যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে যাও তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৬)

নাজাসাত বা অপবিত্রতার প্রকারভেদ

নাজাসাত দুই প্রকার:

১. নাজাসাতে হাকিকি বা প্রকৃত অপবিত্রতা
২. নাজাসাতে হুকমি বা অপ্রকৃত অপবিত্রতা

নাজাসাতে হাকিকি: নাজাসাতে হাকিকি বলতে ঐ সকল অপবিত্র বস্তুকে বোঝায় যেগুলো প্রকৃতিগতভাবেই অপবিত্র এবং ইসলামি শরিয়ত সেগুলোকে অপবিত্র ঘোষণা করে। ঐ সকল অপবিত্র বস্তুকে মানুষ অপছন্দ করে। যেমন: প্রস্রাব, পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি। ইসলাম এসব থেকে শরীরকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

নাজাসাতে হুকমি: নাজাসাতে হুকমি হচ্ছে ঐ সকল অপবিত্রতা যা দেখা যায় না কিন্তু ইসলামি বিধানে তা নাজাসাত বা অপবিত্র বলে গণ্য। যেমন: ওযু ভঙ্গ হওয়া, গোসলের প্রয়োজন হওয়া ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, উভয় প্রকার অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায়সমূহ

আল্লাহ তা'আলা নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি ও পবিত্র বস্তুকে পছন্দ করেন। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জন করা জরুরি। ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জনের উপায়গুলো হলো–

১. **ওযু:** শরীর পবিত্র করার নিয়তে পাক-পবিত্র পানি দিয়ে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী মুখমণ্ডল, দুই হাত (কনুই সহ) ও দুই পা (টাখনু সহ) ধৌত করা এবং মাথা মাসাহ্ করার নাম ওযু। যে পানি দিয়ে ওযু করা হবে তা অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যেমন– নদী, খাল, পুকুর, কূপ, ঝরনা, নলকূপ বা শহরে সরবরাহ করা পানি।

২. **গোসল:** পবিত্র পানি দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে পুরো শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে। গোসলের মাধ্যমে পুরো শরীর পবিত্র হয়ে যায়।

৩. **তায়াম্মুম:** পানি পাওয়া না গেলে অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোগী পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ্ করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলে।

ইসলাম মনের পবিত্রতার ওপর খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। খ্যাতিমান ইসলামি পণ্ডিতগণ মনের কতিপয় মৌলিক রোগ চিহ্নিত করেছেন। তা হলো লোভ, উচ্চাশা, রাগ, মিথ্যা বলা, গিবত (পরনিন্দা), কার্পণ্য, অহংকার, রিয়া (লোক দেখানো), হাসাদ (হিংসা)। উপর্যুক্ত পাপগুলো থেকে বেঁচে থাকলে মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ ছাড়া ইসলামের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো যথাযথভাবে আদায়ের মাধ্যমে মনের পবিত্রতা অর্জন করা যায়। কোনো মুমিন যদি ইবাদাতের পাশাপাশি হালাল খাদ্য গ্রহণ করেন, হারাম থেকে বেঁচে থাকেন, কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং সদা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করেন তবে তাঁর অন্তর পবিত্র থাকবে। এবার আমরা পবিত্র থাকার লক্ষ্যে ওযু, গোসল এবং তায়াম্মুমের নিয়মগুলো জেনে নেবো।

ওযু (اَلْوُضُوْءُ)

ওযু আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– পবিত্রতা অর্জনের জন্য শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী মুখমণ্ডল, দুই হাত (কনুইসহ) ও দুই পা (টাখনুসহ) ধৌত করা এবং মাথা মাসাহ্ করার নাম ওযু। এ চারটি কাজ ওযুর ফরজ। তবে কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ইত্যাদি ওযুর সুন্নাত।

ওযুর গুরুত্ব

ওযু ব্যতীত সালাত আদায়, কাবাঘরের তাওয়াফসহ বেশ কিছু ইবাদাত করা যায় না। ভালোভাবে ওযু করলে মন প্রফুল্ল থাকে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ থাকে। ইবাদাতেও একাগ্রতা আসে। ওযুর ফজিলত সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে চিনতে পারবো।' জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কীভাবে আমাদের চিনবেন? নবি করিম (সা.) বললেন, 'ওযুর ফলে আমার উম্মতের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা উজ্জ্বলতায় চকচক করবে। তাতেই আমি আমার উম্মতকে চিনতে পারব।' (বুখারি ও মুসলিম)

ওযুর নিয়ম

ওযু করার জন্য প্রথমে পবিত্রতার নিয়তে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতে হবে। এরপর দুই হাতে পানি নিয়ে কবজি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করতে হবে। এক হাতের আঙুল দিয়ে অন্য হাতের আঙুল খিলাল করতে হবে। এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করতে হবে। গড়গড়া করে কুলি করা উত্তম। তবে রোযাদার হলে গড়গড়া করা যাবে না। তারপর নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পুরো মুখমণ্ডল তিন বার এমনভাবে ধৌত করতে হবে যাতে চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে। যাদের ঘনদাড়ি আছে, তারা আঙুল দিয়ে দাড়ি খিলাল করবে। এরপর ডান হাত কনুইসহ তিন বার ধৌত করবে। একই সঙ্গে ডান হাত দিয়ে বাম হাত কনুইসহ তিন বার ধৌত করবে। হাতে ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি থাকলে তা এমনভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে, যাতে সবখানে ভালোভাবে পানি পৌঁছে যায়। অতঃপর দুই হাত ভিজিয়ে মাথা মাসাহ্ করবে। সবশেষে দুই পা টাখনুসহ ভালোভাবে ধৌত করতে হবে যাতে একটু জায়গাও শুকনো না থাকে। যদি ওযু করার স্থানে ক্ষত বা ব্যান্ডেজ থাকে আর রোগী যদি আশঙ্কা করে যে, পানি লাগলে ক্ষতস্থানের ক্ষতি হবে, এমতাবস্থায় ঐ স্থানের চারপাশে পানি দিয়ে ধৌত করে শুধু ব্যান্ডেজের ওপরে মাসাহ্ করবে। তবে ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেলে অবশ্যই পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

ওযুর কাজগুলো পরপর করে যেতে হবে। অর্থাৎ এক অঙ্গের পর অন্য অঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ধৌত করতে হবে। অনেকক্ষণ থেমে থেমে করা যাবে না।

ওযুর ফরয

ওযুর ফরয চারটি। এ চারটির মধ্যে কোনো একটি বাদ পড়লে ওযু হবে না। ওযুর ফরযগুলো হলো :

১. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা।

২. উভয় হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা।

৩. মাথার চারভাগের একভাগ একবার মাসাহ্ করা।

৪. উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা। (তবে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত ও পা আবার ধৌত করা সুন্নাত)

ওযু ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে ওযু ভঙ্গ হয় তা নিম্নরূপ:

- প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হলে।
- শরীরের কোনো স্থান হতে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে।
- মুখভর্তি বমি হলে। বমির সঙ্গে রক্ত, পুঁজ, খাদ্য বা অন্যকিছু বের হলেও ওযু ভেঙে যাবে।
- থুথুর সঙ্গে বেশি পরিমাণে রক্ত বের হলে।
- শুয়ে অথবা হেলান দিয়ে ঘুমালে।
- নেশাগ্রস্ত হলে।
- বেহুঁশ হলে।
- নামাজে অট্টহাসি দিলে।

অনুশীলন

শিক্ষকের সহায়তায় নিয়ম মেনে ওযু করা অনুশীলন করো।

গোসল (اَلْغُسْلُ)

গোসল অর্থ ধৌত করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় গোসল বলতে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা পুরো শরীর ধৌত করাকে বোঝায়।

গোসলের নিয়ম

শুরুতেই বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে পানি নিয়ে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ভালোভাবে ধৌত করতে হবে। তারপর শরীরের কোনো স্থানে অপবিত্র কিছু লেগে থাকলে তাতে পানি ঢেলে ও প্রয়োজনে হালাল সাবান মেখে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর ভালোভাবে ওযু করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কুলি করার সময় পানি যেন কণ্ঠদেশে প্রবেশ করে অর্থাৎ গড়গড়ার সাথে কুলি করতে হবে। আর নাক পরিষ্কার করার সময় যেন ভিতরে ভালোভাবে পানি প্রবেশ করে। ওযুর পর মাথায় এমনভাবে পানি ঢালতে হবে যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর ডান কাঁধে, তারপর বাম কাঁধে পানি ঢেলে পুরো শরীর ভালোভাবে ধৌত করতে হবে যেন শরীরের কোনো অংশ শুকনো না থাকে। নাভি, বগল ও দেহের অন্যান্য ভাঁজে পানি পৌঁছিয়ে সতর্কতার সঙ্গে ধৌত করতে হবে। সবশেষে পা ধৌত করতে হবে।

গোসলের ফরয

গোসলের ফরয তিনটি। যথা–

১. গড়গড়া করে কুলি করা;

২. নাকের ভেতরে পানি পৌঁছানো;

৩. সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধোয়া।

তায়াম্মুম (اَلتَّيَمُّمُ)

তায়াম্মুম অর্থ ইচ্ছা করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলতে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু (যেমন: পাথর, চুনাপাথর, বালি ইত্যাদি) দ্বারা পবিত্র হওয়ার নিয়তে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসাহ্ করাকে বোঝায়। পবিত্রতা অর্জনের প্রকৃত মাধ্যম হলো পানি। তবে পানি পাওয়া না গেলে অথবা পাওয়া গেলেও পানি ব্যবহারে রোগবৃদ্ধি বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলে ওযু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ্ করবে।' (সূরা আল- মায়িদা, আয়াত: ৬)

তায়াম্মুম করার নিয়ম

প্রথমে তায়াম্মুমের নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়বে। তারপর দুই হাতের তালু একটু প্রসারিত করে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু, যেমন: পাথর, চুনাপাথর, বালি ইত্যাদিতে দুই হাত লাগিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসাহ্ করবে। পুনরায় দুই হাত মাটিতে লাগিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসাহ করবে। হাতে ঘড়ি বা অন্য কোনো জিনিস থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসাহ করতে হবে।

তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। যথা–

১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা;

২. পবিত্র মাটি দিয়ে পুরো মুখমণ্ডল মাসাহ্ করা;

৩. পবিত্র মাটি দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসাহ্ করা।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় তা নিম্নরূপ:

- যেসব কারণে ওযু ভেঙে যায়, সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভেঙে যায়।
- পানির অভাবে তায়াম্মুম করার পর পানি পাওয়া গেলে।
- যেসব কারণে তায়াম্মুম করা জায়েয (বৈধ) ছিল, সেসব কারণ দূর হয়ে গেলে। যেমন: কোনো রোগের কারণে তায়াম্মুম করা হলে, সেই রোগ সেরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তায়াম্মুম ভেঙে যায়।

অনুশীলন

শিক্ষকের সহায়তায় তায়াম্মুম করার পদ্ধতি অনুশীলন করো।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পবিত্রতার ভূমিকা

আমরা সবাই ভালো থাকতে চাই। ভালো থাকতে হলে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ থাকলে মনে সুখ-শান্তি থাকে না; ফলে নানারকম শারীরিক ও মানসিক রোগ সৃষ্টি হয়। এই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পবিত্রতার ভূমিকা অপরিসীম। ইসলাম পবিত্রতার

উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে। ইসলাম শারীরিক পবিত্রতার সাথে সাথে মানুষের আত্মিক পবিত্রতা, বিশ্বাসের পবিত্রতা, কর্মের পবিত্রতা, আর্থিক পবিত্রতা, পরিবেশের পবিত্রতা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করে। পবিত্রতা শরীরকে রাখে সতেজ ও সবল, মনকে রাখে প্রফুল্ল। ফলে সেই শরীর ও মন থাকে রোগ-জীবাণু থেকে সুরক্ষিত।

অপবিত্রতা থেকে নানারকম রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ নোংরা থাকলে রোগ-জীবাণু ছড়ায়। পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো।' (সূরা আল-মুদ্দাছছির, আয়াত: ৪-৫)

বর্তমানে ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিকভাবে 'বিশ্ব হাতধোয়া দিবস' পালিত হয়। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ সংক্রমিত হওয়ার পর দেশের প্রায় সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হাত ধোয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওযু, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে। দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায়ের জন্য ওযু করতে হয়। ওযু করলে শরীর থেকে যেমন রোগ-জীবাণু ধুয়ে যায়, তেমনি গুনাহসমূহও বের হয়ে যায়। এর মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা অর্জিত হয়।

মানব শরীরে মুখগহ্বর স্পর্শকাতর একটি স্থান। আমরা সারাদিন নানা রকম খাবার গ্রহণ করি। আমরা যদি সব সময় মুখ পরিষ্কার না রাখি তাহলে নানারকম রোগের পাশাপাশি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। তাই মহানবি (সা.) নিয়মিত মিসওয়াক করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন।

শরীরিক পবিত্রতার সঙ্গে মানসিক শান্তি একই সূত্রে গাঁথা। আমরা শারীরিকভাবে পবিত্র থাকলে আত্মিক প্রশান্তি পাবো। মন থাকবে প্রফুল্ল ও সতেজ। সুতরাং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পবিত্রতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের সব সময় পবিত্র থাকার এবং আমাদের আশপাশের পরিবেশকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করা উচিত।

তাহলে এতক্ষণ আমরা পবিত্র থাকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং এর বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে জানলাম।

অনুশীলন

বন্ধুরা মিলে দলগতভাবে পবিত্র থাকার সুফলসমূহ আলোচনা করো।

এবার এসো আল্লাহর ইবাদাতের অন্যতম মাধ্যম সালাত বা নামায সম্পর্কে জেনে নিই।

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

সালাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আহকাম, আরকানসহ বিশেষ নিয়মে ও নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর ইবাদাত করার নাম সালাত (নামায)। ইসলামে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের মধ্যে সালাত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন। পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ: 'এবং তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত আদায় করো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, হজ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।' (বুখারি ও তিরমিযি)

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান পুরুষ এবং নারীর ওপর নির্ধারিত সময়ে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সালাত আদায়ের নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স ১০ বছর হয়, তখন সালাতের ব্যাপারে (প্রয়োজনে) শাসন করো।' (আবু দাউদ)

সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভে সালাত অন্যতম। ইমানের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে সালাত। কুরআন ও হাদিসে অসংখ্য স্থানে সালাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সালাত এমন একটি ফরয ইবাদাত যার কোনো বিকল্প নেই।

ব্যক্তি জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সালাত বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। সালাত আদায়ের ফলে মনে প্রশান্তি আসে এবং সাহসের সঞ্চার হয়। কোনো বিষয়ে অস্থিরতা দেখা দিলে মহানবি (সা.) সালাত আদায় করতেন। এতে তাঁর মানসিক প্রশান্তি লাভ হতো।

সালাত ব্যক্তির নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক। সালাত মানুষকে পাপকাজ এবং পাপ চিন্তা

থেকে বিরত রাখে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

অর্থ: 'আর সালাত প্রতিষ্ঠা করো; নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আল্-আনকাবূত, আয়াত: ৪৫)

সমাজ জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সালাতের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অশ্লীল ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা যায়। জামাআতে সালাত আদায় করলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। সবার মধ্যে ঐক্য, সংহতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়। জামা'আতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দূর হয়।

সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ এবং বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কারও বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে, আর তাতে যদি কেউ দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার গায়ে কি ময়লা থাকতে পারে?' সাহাবিগণ বললেন– 'না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!' মহানবি (সা.) তখন বললেন, 'একইভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাপ মোচন করে থাকেন।'

সালাতের সময়সূচি

যথাসময়ে সালাত আদায় করা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

অর্থ: 'নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩)

আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করার পর হযরত জিবরাইল (আ.) -এর মাধ্যমে নবি করিম (সা.) কে সালাত আদায়ের পদ্ধতি এবং সালাতের সময় জানিয়ে দিয়েছেন।

সালাতের সময়

ফজর: ফজরের সালাত শুরু হয় সুবহে সাদিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। আকাশের পূর্ব দিগন্তে রাতের শেষ অংশে লম্বমান যে আলোর রেখা দেখা দেয়, তাকেই বলে সুবহে সাদিক।

আলো ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং শেষে সূর্যোদয় ঘটে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজর সালাতের সময়।' (মুসলিম)

যোহর: সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। কোনো বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া (ছায়া আসলি) ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এই সময় থাকে। ঠিক দুপুরের সময়ে কোনো বস্তুর যেটুকু ছায়া থাকে, তাকেই 'ছায়া আসলি' বা আসল ছায়া বলে। যেমন এক হাত লম্বা একটি কাঠির আসল ছায়া দুপুরবেলা চার আঙুল ছিল। তারপর ঐ কাঠির ছায়া যখন দুই হাত চার আঙুল হবে, তখন যোহরের সময় শেষ হয়ে যাবে। গরমের সময় যোহরের সালাত বিলম্বে এবং শীতের মৌসুমে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা উত্তম।

আসর: যোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করলে আসরের সালাত আদায় করা মাকরুহ। তবে, সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আসর ছাড়া সব ধরনের সালাত নিষিদ্ধ।

মাগরিব: সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লালিমা থাকে ততক্ষণ মাগরিবের সময় বাকি থাকে। তাই সময় হওয়ার সাথে সাথে সালাত আদায় করা উত্তম।

এশা: মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর এশার সালাতের সময় শুরু হয় এবং সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যে এশার সালাত আদায় করা উত্তম।

বিতর: বিতর সালাতের প্রকৃত সময় শেষরাত। তবে এশার সালাতের পর পরও আদায় করা যায়। কিন্তু এশার আগে পড়া যায় না।

সালাতুল জুমু'আ: যোহরের ওয়াক্তই জুমু'আর ওয়াক্ত। সাধারণত ওয়াক্ত শুরু হলেই আযান দেওয়া হয় এবং ইমামগণ হেদায়াত-নসিহতমূলক বক্তব্য দিয়ে থাকেন। জুমু'আর দুই রাকাআত ফরজ সালাতের আগে ইমাম সাহেব মিম্বারে দাঁড়িয়ে দুটি আনুষ্ঠানিক ভাষণ (খুতবা) দেন। এসময় মুসল্লিদের চুপ থেকে তা শুনতে হয়।

সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। মহানবি (সা.) এর প্রদর্শিত পন্থায় আমাদের সালাত আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছ।' (বুখারি)

বিনীত ও একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করতে হয়। লোক দেখানো কিংবা উদাসীনভাবে আদায় করা সালাত আল্লাহ কবুল করেন না। সালাত আদায়কালে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, সালাতের শর্তগুলোর কোনোটাই যেন বাদ না পড়ে। পবিত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। মনে করতে হবে যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখছেন।

দুই, তিন ও চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়মে কিছুটা তারতম্য আছে। নিচে এর বিবরণ দেওয়া হলো:

দুই রাকাআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে নিয়ত করে দুই হাত কান বরাবর ওঠাবো এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে নাভির নিচে হাত বাঁধবো। তবে মেয়েরা কাঁধ পর্যন্ত হাত ওঠাবে এবং হাত বাঁধবে বুকের ওপর।

নিয়ত মনে মনে করলেই চলবে, তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। এরপর 'সানা' পড়ব। তারপর 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' অনুচ্চ আওয়াজে পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ব। ফাতিহা পড়া শেষ হলে মনে মনে আমিন বলবো। এরপর অন্য কোনো সূরার কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি সূরা পড়বো। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকু করব।

রুকুতে কমপক্ষে একবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম' বলব। তারপর 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। দাঁড়ানো অবস্থায় 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলব। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদাহ্ করব। সিজদায় কমপক্ষে একবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলব। প্রথম সিজদাহ্র পর সোজা হয়ে বসব। দু'টি সিজদাহ্ করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এভাবে প্রথম রাকাআত শেষ হবে। উল্লেখ্য, রুকু ও সাজদায় তিন বা ততোধিক বিজোড় সংখ্যক তাসবিহ পড়া সুন্নাত। এক তাসবিহ পরিমাণ সময় রুকু ও সিজদায় থাকা ফরজ।

এখন দ্বিতীয় রাকাআত শুরু হলো। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর পূর্বের মতো সূরা মিলাবো। তারপর প্রথম রাকাআতের মতো রুকু ও সিজদাহ করে সোজা হয়ে বসব। তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে প্রথমে ডানে ও পরে বামে মুখ ফিরিয়ে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলব। এইভাবে দুই রাকাআত বিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।

তিন রাকাআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

তিন রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাতে দ্বিতীয় রাকাআতের পর শুধু তাশাহহুদ পড়ব। তারপর তাকবির বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। অন্য কোনো সূরা পড়ব না। এরপর পূর্বের মতো রুকু, সিজদাহ করব। সিজদার পর সোজা হয়ে বসে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব।

চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাতে দ্বিতীয় রাকাআতের পর ১ম বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়ব। পরে তৃতীয় রাকাআতের জন্য তাকবির বলে উঠে দাঁড়াব। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর রুকু-সিজদাহ করে চতুর্থ রাকাআতের জন্য উঠে দাঁড়াব। চতুর্থ রাকাআতে তৃতীয় রাকাআতের

মতো সূরা ফাতিহা পড়ে রুকু সিজদাহ করার পর ২য় বৈঠকে বসে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব।

ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল সালাত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ব।

অনুশীলন

শিক্ষকের সহায়তায় নিয়ম মেনে ওয়াক্ত অনুসারে সালাত আদায় অনুশীলন করো।

সালাতের আহকাম ও আরকান

সালাত আদায় যথাযথ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যার কোনো একটি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। সালাতে মোট ফরয চৌদ্দটি। সালাতের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক সাতটি ফরয রয়েছে। এগুলোকে সালাতের আহকাম বলা হয়। আর সালাতের ভিতরে সাতটি ফরয রয়েছে। এগুলোকে সালাতের আরকান বলা হয়। সালাতের আহকাম ও আরকান নিম্নরূপ:

সালাতের আহকাম

১. শরীর পবিত্র হওয়া।

২. পরিধানের কাপড় পবিত্র হওয়া।

৩. সালাতের স্থান অর্থাৎ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা হবে তা পবিত্র হওয়া। কমপক্ষে দাঁড়ানোর জায়গা থেকে সিজদাহর জায়গা পর্যন্ত পবিত্র হতে হবে।

৪. সতর ঢাকা। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং নারীদের মুখমণ্ডল, হাতের কবজি ও পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা।

৫. কিবলামুখী হওয়া, অর্থাৎ কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা। কিবলা অজানা হলে নিজের প্রবল ধারণা অনুসারে কিবলা নির্ধারণ করে সালাত আদায় করতে হবে।

৬. সালাতের সময় হওয়া।

৭. নিয়ত করা, অর্থাৎ যে ওয়াক্তের সালাত পড়তে হবে, মনে মনে সেই ওয়াক্তের নিয়ত করা।

সালাতের আরকান

১. তাকবিরে তাহরিমা তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করা।

২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে এবং বসতে অক্ষম হলে শোয়া অবস্থায় ইশারায় সালাত আদায় করতে হবে।

৩. কিরাআত পড়া, অর্থাৎ সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করা।

৪. রুকু করা।

৫. সিজদাহ করা।

৬. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা (যে বৈঠকের মধ্যে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা হয় সেটাই শেষ বৈঠক)।

৭. সালামের মাধ্যমে সালাত থেকে বের হওয়া।

দলগত কাজ

বন্ধুরা মিলে সালাতের আহকাম এবং আরকান সংক্ষেপে পোস্টারে লিখে শ্রেণিকক্ষে সকলের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করো।

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতের ওয়াজিব বলতে ঐ সব করণীয় বিষয় বোঝায়, যার কোনো একটি ভুলক্রমে ছুটে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' আদায় করে সালাত শুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায় এবং পুনরায় সালাত আদায় করতে হয়। সালাতের ওয়াজিব চৌদ্দটি। এগুলো নিম্নরূপ:

১. প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়া।

২. সূরা ফাতিহার সঙ্গে কোনো একটি সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা।

৩. রুকূ, সিজদাহ ও তিলাওয়াতের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৪. সালাতের রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা। অর্থাৎ রুকু, সিজদাহ, দাঁড়ানো, বসায় কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা।

৫. রুকূ করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৬. দুই সিজদাহ এর মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৭. প্রথম বৈঠক অর্থাৎ তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতে দুই রাকাআত আদায়ের পর তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসা।

৮. প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা।

৯. ইমামের জন্য উচ্চঃস্বরে কিরাআত পড়ার সালাতে উচ্চঃস্বরে এবং চুপে চুপে পড়ার সালাতে চুপে চুপে কিরাআত পড়া।

১০. বিতর সালাতে দোয়া কুনুত পাঠ করা।

১১. সালাতের মধ্যে সিজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করলে তিলাওয়াতে সিজদাহ করা।

১২. সিজদাহর মধ্যে উভয় হাত ও হাঁটু মাটিতে রাখা।

১৩. দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।

১৪. 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে সালাত সমাপ্ত করা।

সালাতের সুন্নাতসমূহ

রাসুলুল্লাহ (সা.) সালাতের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব ছাড়াও কিছু আমল বা কাজ করেছেন কিন্তু এগুলো আদায়ের ব্যাপারে ফরয ও ওয়াজিবের মতো গুরুত্বারোপ করেননি। এগুলোকে বলা হয় সুন্নাত। যদিও এগুলো ছুটে গেলে সালাত নষ্ট হয় না কিংবা সাহু সিজদাহ দিতে হয় না, তবুও রাসুলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণ করে এগুলো মেনে চলা উচিত। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সা.) এভাবে সালাত আদায় করেছেন এবং অন্যকেও এভাবে আদায় করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা সালাত আদায় করো, যেভাবে তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।' (বুখারি)

সালাতের উল্লেখযোগ্য সুন্নাত

১. তাকবির-ই-তাহরিমা বলার সময় পুরুষের কানের লতি ও নারীদের কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত ওঠানো।

২. তাকবির বলার সময় দুই হাতের আঙুলগুলো খুলে রাখা এবং কিবলামুখী করে রাখা।

৩. নিয়ত করার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা। পুরুষের জন্য নাভির নিচে এবং নারীদের বুকের উপর হাত রাখা।

৪. তাকবির-ই-তাহরিমা বলার সময় মাথা অবনত না করা।

৫. ইমামের জন্য উঁচু আওয়াজে তাকবির বলা।

৬. সানা পড়া।

৭. প্রথম রাকাআতে সানা পড়ার পর আউযুবিল্লাহ পড়া।

৮. প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়া।

৯. ফরয সালাতের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া।

১০. সূরা ফাতিহা পাঠের পর আমিন বলা।

১১. সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমিন আস্তে বলা।

১২. এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সময় তাকবির বলা।

১৩. রুকু ও সিজদায় তাসবিহ পড়া।

১৪. রুকুতে মাথা ও কোমর সোজা রাখা এবং দুই হাতের আঙুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা।

১৫. রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' ও মুক্তাদির 'রাব্বানা লাকাল হামদ্' বলা।

১৬. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক এবং সবশেষে কপাল মাটিতে রাখা।

১৭. বসার সময় বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখা।

১৮. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ পড়া।

১৯. দরুদের পর দোয়া মাসুরা পড়া।

২০. প্রথমে ডানে এবং পরে বামে সালাম ফিরানো।

সালাতের মুস্তাহাব

মুস্তাহাব অর্থ উত্তম, পছন্দনীয়। ইসলামের পরিভাষায় মুস্তাহাব বলা হয় এমন আমলকে যা পালন করলে সাওয়াব আছে কিন্তু ছেড়ে দিলে কোনো গুনাহ হয় না। সালাতের মধ্যে এমন কিছু আমল আছে যা পালন করলে সাওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু পালন না করলে কোনো গুনাহ হয় না। এ গুলোকে সালাতের মুস্তাহাব বলে। নিম্নে সালাতের কতিপয় মুস্তাহাব উল্লেখ করা হলো:

১. সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদাহ এর স্থানে দৃষ্টি রাখা

২. রুকু করার সময় পায়ের উপর, সিজদাহর সময় নাকের উপর এবং বসা অবস্থায় কোলের উপর দৃষ্টি রাখা।

৩. সালাতের মধ্যে হাঁচি, কাঁশি দেওয়া ও হাই তোলা থেকে বিরত থাকতে সাধ্যমত চেষ্টা করা।

৪. সালাতে ধীরস্থিরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা।

৫. সিজদাহ আদায়কালে উভয় হাতের মাঝখানে মাথা রাখা।

৬. মাগরিব সালাতে ছোট সূরা পাঠ করা।

৭. একাকী সালাত আদায়কালে রুকু ও সিজদাহর তাসবিহ তিনবারের বেশি (পাঁচ, সাত, নয় ইত্যাদি) পড়া।

সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ

সালাতের শুরুতে আমরা নিয়ত করে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হাত বাঁধি। একে বলা হয় তাকবির-ই-তাহরিমা। এ তাকবির বলার পর সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাড়া অন্য কোনো কাজ বা কথা বলা হারাম হয়ে যায়। যদি কেউ এমন করে ফেলে, তবে তার সালাত বাতিল হবে। সালাত বাতিল বা ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. সালাতের মধ্যে কাউকে সালাম দিলে বা সালামের উত্তর দিলে।

২. সালাতের মধ্যে কথা বললে।

৩. কিছু খেলে।

৪. কিছু পান করলে।

৫. শব্দ করে অট্টহাসি হাসলে সালাত এবং ওযু উভয়ই ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৬. বিপদ বা কষ্টের কারণে উচ্চঃস্বরে কাঁদলে।

৭. ব্যথা বা রোগের কারণে 'উহ্ আহ্' এরূপ শব্দ করলে।

৮. সালাতে কুরআন মাজিদ দেখে পড়লে।

৯. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরালে।

১০. দুই হাত দিয়ে কোনো কাজ করলে।

১১. মুক্তাদি ইমাম অপেক্ষা সামনে দাঁড়ালে।

১২. নাপাক স্থানে সিজদাহ করলে।

১৩. সালাতে দুনিয়ার কোনো কিছু প্রার্থনা করলে।

১৪. বিনা কারণে বারবার কাশি দিলে।

১৫. সালাতের কোনো ফরয বাদ গেলে।

১৬. কোনো সুসংবাদে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে।

১৭. কোনো দুঃসংবাদে 'ইন্নালিল্লাহ' বললে।

১৮. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে।

১৯. হাঁচির উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললে।

২০. নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কারো ভুল ধরলে।

২১. আমলে কাসির করলে (এমন কাজ করা যা দেখলে কেউ মনে করবে যে সে সালাত আদায়রত নয়)।

সালাত মাকরুহ হওয়ার কারণ

মাকরুহ অর্থ অপছন্দনীয়। এমন কিছু কাজ আছে যা সালাতের মধ্যে করা হলে সালাত নষ্ট হয় না কিন্তু সাওয়াব কম হয়, সেগুলো সালাতের মাকরুহ কাজ। সালাতের এমন কিছু মাকরুহ কাজের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. সালাতের মধ্যে ইচ্ছাকৃত আঙ্গুল মটকানো।

২. অলসতা করে খালি মাথায় সালাত আদায় করা।

৩. পরিধানের কাপড় ধুলাবালি থেকে রক্ষা করার জন্য গুটিয়ে নেওয়া।

৪. পরিধানের কাপড়, জামার বোতাম, দাড়ি ইত্যাদি অহেতুক নাড়াচাড়া করা।

৫. অশালীন ও ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা।

৬. প্রস্রাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে সালাত আদায় করা।

৭. সালাতের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানো।

৮. সিজদাহর সময় দুই হাত কনুই পর্যন্ত জমিনে বিছিয়ে দেওয়া।

৯. ইমামের মিহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো।

১০. প্রাণির ছবিযুক্ত কাপড় পরে সালাত আদায় করা।

১১. সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনে একাকী দাঁড়ানো।

১২. সালাতের মধ্যে ইশারায় অন্যকে সালাম করা।

১৩. শুধু কপাল বা শুধু নাক মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদাহ করা।

১৪. বিনা কারণে শুধু ইমামের উঁচুস্থানে দাঁড়ানো।

১৫. বিনা কারণে চারজানু হয়ে বসা।

১৬. চোখ বন্ধ করে সালাত আদায় করা।

১৭. তিলাওয়াত পূর্ণ না করেই রুকুর জন্য ঝুঁকে পড়া।

১৮. সিজদার সময় মাটি থেকে পা উঠানো।

১৯. সালাতের মধ্যে আয়াত ও অন্যান্য তাসবিহ হাতের আঙ্গুল দিয়ে গণনা করা।

২০. মুখের ভিতরে এমন বস্তু রাখা যাতে তিলাওয়াতে অসুবিধা হয়।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময়ে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ:

১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়।

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়।

৩. সূর্যাস্তের সময়, আর কোনো কারণে ঐদিনের আসরের সালাত আদায় করতে না পারলে তা ঐ সময় আদায় করা যাবে তবে মাকরুহ বা অপছন্দনীয়ভাবে আদায় হয়ে যাবে।

সালাতের মাকরুহ সময়

১. ফজরের সালাত আদায়ের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত।

২. আসরের সালাত আদায়ের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৩. ফজরের সময় শুরু হলে ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোনো সালাত আদায় করা।

৪. ফরয সালাতের যখন তাকবির দেওয়া হয় তখন অন্য কোনো সালাত শুরু করা।

৫. যখন ইমাম সাহেব জুমুআর খুতবা দিতে থাকেন তখন কোনো সালাত শুরু করা।

৬. বিনা কারণে এশার সালাত মধ্যরাতের পরে আদায় করা।

সিজদাহ্ (اَلسَّجْدَةُ)

'সিজদাহ্' আরবি শব্দ। এর অর্থ মাথা অবনত করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য

বান্দাহ তার কপাল জমিনে রাখাকে সিজদাহ্ বলে। সিজদাহ্ এমন এক সম্মাননা, যা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। মাটিতে কপাল ও নাক স্পর্শ করে সিজদাহ্ করতে হয়। একইসাথে সিজদার সময় উভয় হাঁটু এবং উভয় হাতের তালু মাটিতে স্থাপন করতে হয়। সিজদাহ্ কিবলার দিকে মুখ করে দিতে হয়।

সিজদাহ্ -এর প্রকারভেদ

ফরয সিজদাহ্: মানুষ নামায আদায়ের সময় যেসব সিজদাহ্ দিয়ে থাকে তাকে ফরজ সিজদাহ্ বলে।

ওয়াজিব সিজদাহ্: ভুলবশত নামাযে কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে এবং সিজদাহ্-এর আয়াত তিলাওয়াত করলে যে সিজদাহ্ দিতে হয় তাকে ওয়াজিব সিজদাহ্ বলে।

মুস্তাহাব সিজদাহ্: খুশির সংবাদ শুনে, কোনো নিয়ামতপ্রাপ্ত হলে বা বিপদমুক্ত হলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যে সিজদাহ্ দেওয়া হয় তাকে মুস্তাহাব সিজদাহ্ বলে।

সিজদায়ে সাহ: সিজদায়ে সাহ্ অর্থ ভুলের জন্য সিজদাহ্। ভুলবশত নামাযে ওয়াজিব বাদ পড়লে, তা সংশোধনের জন্য নামাযের শেষ বৈঠকে দুটি সিজদাহ্ করা হয়, একেই সিজদায়ে সাহ্ বলে।

সিজদায়ে সাহ্ আদায় করার নিয়ম

নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফেরাব। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযের সিজদাহ্-এর ন্যায় দু'টি সিজদাহ্ করে তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়া মাসুরা পড়ব। তারপর দুইদিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব। সিজদায়ে সাহ্ সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমাদের কারও সালাতে সন্দেহ হলে সঠিকটি ভেবে নিয়ে সালাত সম্পূর্ণ করে একবার সালাম ফেরাবে তারপর দুটি সাজদাহ্ করবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সিজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব হওয়ার কারণ

১. ভুলবশত নামাযের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে;
২. নামাযের কাজগুলো পরপর আদায় করতে বিলম্ব করলে (যেমন: সূরা ফাতিহা পড়ার পর চুপ করে থাকলে, কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর কোনো সূরা পড়লে);
৩. কোনো ফরয আদায় করতে বিলম্ব হলে।
৪. নামায আদায়ে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম হলে (যেমন: রুকুর আগেই সিজদাহ্ করলে);
৫. কোনো ফরয একবারের স্থলে একাধিকবার হলে;
৬. কোনো ওয়াজিবের রূপ পরিবর্তন করলে (যেমন: সরবে তিলাওয়াতের স্থলে নীরবে এবং নীরবে তিলাওয়াতের স্থলে সরবে পড়লে) ইত্যাদি।
৭. মনে রাখা দরকার, প্রথম বৈঠক করতে ভুলে গেলে যদি দাঁড়ানোর পূর্বেই মনে পড়ে তাহলে বসে যাব এবং বৈঠক পূর্ণ করব। আর যদি দাঁড়ানোর পর বা প্রায় দাঁড়াবার কাছাকাছি অবস্থায় মনে পড়ে তাহলে বসব না। নামায শেষে সাহ সিজদাহ্ করব।

সিজদায়ে তিলাওয়াত (سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ)

পবিত্র কুরআন মাজিদে কতগুলো আয়াত আছে যা পড়লে বা শুনলে সিজদাহ্ করা জরুরি। সিজদাহ্ আদায় না করলে গুনাহগার হবে। হাদিসে আছে, 'যখন কেউ সিজদাহ্-এর আয়াত পড়ে সিজদাহ্ করে তখন শয়তান একপাশে বসে বিলাপ করতে থাকে এবং বলে, হায় আফসোস! আদম সন্তানদের সিজদাহ্-এর হুকুম দেওয়া হলো, তারা সিজদাহ্ করল এবং জান্নাতের দাবিদার হলো। আর আমাকে সিজদাহ্-এর হুকুম দেওয়া হলো আমি অস্বীকার করে জাহান্নামি হলাম।' (মুসলিম)

সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে সরাসরি সিজদায় চলে যাবে এবং সিজদাহ্ করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে দাঁড়াতে হবে। তাশাহহুদ পড়া ও সালাম ফেরানোর প্রয়োজন নেই। সিজদায়ে তিলাওয়াতে একটি সিজদাহ্ করলেই চলবে।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের চারটি শর্ত

১. তাহারাত অর্থাৎ পবিত্র হওয়া;
২. সতর ঢাকা;
৩. কিবলামুখী হওয়া;
৪. সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করা।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থান

১. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ২০৬	২. সূরা আর রা'দ, আয়াত: ১৫
৩. সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫০	৪. সূরা বানি ইসরাইল, আয়াত: ১০৯
৫. সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৮	৬. সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ১৮ , ৭৭
৭. সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬০	৮. সূরা আন-নামল, আয়াত: ২৬
৯. সূরা আস্ সাজদাহ্, আয়াত: ১৫	১০. সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৪
১১. সূরা হা-মীম-আস-সাজ্‌দা, আয়াত: ৩৮	১২. সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৬২
১৩. সূরা আল-ইনশিকাক, আয়াত: ২১	১৪. সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ১৯

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং সূরার নাম ও আয়াত নম্বরসহ সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থানসমূহ ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের শিক্ষা

সালাত বা নামায ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। এর সঙ্গে নৈতিকতার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামের বিধান মেনে নিয়মিত সালাত আদায় করলে যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, সেই সঙ্গে মানুষের নৈতিক চরিত্রেরও উন্নতি ঘটে।

নিয়মিত সালাত আদায়ের ফলে একজন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রের যেসব উন্নয়ন ঘটে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	সালাত আদায়কারীকে অবশ্যই পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। সালাত আদায়ের আগে আমাদেরকে ওযু করতে হয় যা আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। এভাবে সালাতের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার শিক্ষা পায়।
সময়ানুবর্তিতা	সালাত আদায়ের নির্ধারিত সময় রয়েছে। একজন মুমিন ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করেন। এভাবে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজেও সময়নিষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা পায়।
শৃঙ্খলা	শৃঙ্খলা অর্থ হলো নির্ধারিত কিছু নিয়মনীতি। একজন ব্যক্তি সালাত একা আদায় করুক বা জামাআতে আদায় করুক, তাকে কিবলামুখী হতে হয়। জামাআতে সালাত আদায় করলে ইমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হয়। এভাবে একজন ব্যক্তির মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জেগে ওঠে।
একাগ্রতা	আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য একজন মুমিন ব্যক্তিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে সালাত আদায় করতে হয়। এ সময় মন স্থির রাখতে হয়। মনে কোনো রকম অস্থিরতা কাজ করলে সঠিকভাবে সালাত আদায় করা যায় না। এভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একাগ্রতার শিক্ষা লাভ করেন।
সাম্য	জামাআতে সালাত আদায়কারী মুসুল্লিগণ মসজিদে একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই উদ্দেশ্য নিয়ে সালাত আদায় করেন। এ সময় ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় কোনো ভেদাভেদ থাকে না। এখানে সবাই সমান। এটি ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের প্রতীক। এভাবে সালাত থেকে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজজীবনেও সাম্যের চর্চার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলনীয় কিছু সুন্নাত ইবাদাত

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় ইমান গ্রহণের পরপরই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (নামায) আদায়, রমযান মাসে সাওম (রোযা) পালন, সামর্থ্যবান হলে হজ্জ পালন এবং যাকাত প্রদান ফরয বা অত্যাবশ্যক ইবাদাত। এগুলো তো পালন করতেই হবে। এর বাইরেও অনেক ভালো কাজ আছে যেগুলো পালনের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় উম্মত হিসেবে গণ্য হতে পারি। এবার এসো, দৈনন্দিন জীবনে পালন করা হয় এমন কিছু ইবাদাত সম্পর্কে জেনে নিই।

কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। কুরআন তিলাওয়াত করা হলো নফল ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদাত। কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। হাদিসে বর্ণিত আছে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ (অক্ষর) তিলাওয়াতের জন্য ১০টি করে সাওয়াব বা পুণ্য লেখা হয়। (তিরমিজি)

তাসবিহ পাঠ

তাসবিহ অর্থ পবিত্রতা ঘোষণা করা, প্রশংসা করা, মহিমা ও গুণগান বর্ণনা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসামূলক বাক্যকে তাসবিহ বলা হয়। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আক্‌বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি হলো তাসবিহ। তাসবিহ পাঠ অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ।

সালাম আদান-প্রদান

সালাম হলো ইসলামি অভিবাদন। সালামের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উন্নয়ন হয়। পরস্পরের দেখা সাক্ষাত হলে 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থাৎ 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' এর মাধ্যমে অপরের কল্যাণ কামনা করা হয় এবং অনুরূপভাবে 'ওয়াআলাইকুমুস্ সালাম অর্থাৎ আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক' বলে সালামের জবাব দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি আগে সালাম দিবে সে বেশি সাওয়াব পাবে। সালাম দেওয়া সুন্নাত ও সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব।

মুসাফাহা

মুসাফাহা শব্দের অর্থ হাতে হাত মেলানো। কোনো সাক্ষাৎকারীর হাত ধরে অভ্যর্থনা জানানোর নাম 'মুসাফাহা'। 'মুসাফাহা' উভয় হাতে করতে হয়।

মু'আনাকা

মু'আনাকা অর্থ গলায় গলা মেলানো বা কোলাকুলি। কোনো ব্যক্তির সাথে দীর্ঘদিন পর বা সফর থেকে ফিরে আসার পর সাক্ষাৎ হলে কোলাকুলি করা সুন্নাত। কোলাকুলিকারী উভয়ে গলা মিলাবে। কোলাকুলির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

প্রিয় শিক্ষার্থী!

তোমরা জানো, কুরআন মাজিদ হলো আমাদের ধর্মগ্রন্থ। এটি মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী। আর হাদিস হলো মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি। কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুটি উৎস। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরলে (মেনে চললে) তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও তাঁর রাসুলের সুন্নাত।' (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে মানবজীবনের সকল সমস্যা সমাধানের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইতোপূর্বে তোমরা এসম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করেছ, এবার একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

আল-কুরআন (الْقُرْاٰنُ)

আল কুরআনের পরিচয়

কুরআন আরবি শব্দ। এর অর্থ পঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত কিতাব। প্রতিদিন কোটি কোটি মুসলমান এই কিতাব তিলাওয়াত করে থাকে। এজন্য এ কিতাবের নাম রাখা হয়েছে আল কুরআন। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এ কিতাবটি নাযিল করেন। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহর সীমাহীন ভালোবাসা ও রহমতের নিদর্শন। মানুষের দুনিয়ার জীবন যাতে সফল, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হয় এবং সেই সাথে পরকালীন জীবনের অনাবিল শান্তিও যেন সে লাভ করতে পারে তার বিস্তারিত পথ নির্দেশনা এ কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি এক মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ।

আল-কুরআন এমন একটি কিতাব যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। আজ পর্যন্ত এটি অবিকৃত রয়েছে। কেউ এর একটি অক্ষর, শব্দ বা হরকতও পরিবর্তন করতে পারেনি। এটি যেভাবে নাযিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান আছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত এটি অবিকৃতই থাকবে। কেননা এর সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক।' (সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯)

কুরআন মাজিদ অবতরণ

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর আল-কুরআন নাজিল করেন। এটি লাওহে মাহফুয বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। লাওহে মাহফুজ থেকে আল-কুরআন প্রথমে কদরের রাতে প্রথম আসমানে 'বাইতুল ইযযাহ' নামক স্থানে এক সাথে নাজিল করা হয়। এরপর সেখান থেকে মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিলের সূচনা হয়েছিল মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায়, ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে। তখন মহানবি (সা.) এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালে সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়।

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

আল-কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। এটি সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী। এটি মানব জাতিকে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য সব উপদেশ এতে বর্ণিত হয়েছে। এটি সর্বপ্রকার দোষত্রুটি, সংশয় সন্দেহ ও ভুলের উর্ধ্বে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

অর্থ: 'এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্য এটি পথপ্রদর্শক।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২)

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বমোট ১০৪ (একশত চার) খানা আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন। এগুলোর মধ্যে ১০০ (একশত) খানা ছোট কিতাব। এগুলোকে বলা হয় সহিফা। আর ৪ (চার) খানা বড় কিতাব। এগুলো হলো: তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআন। আল কুরআন হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত এটি সকল মানুষের হেদায়াতের উৎস। এরপর আর কোনো কিতাব নাযিল হবে না।

কুরআন মাজিদ সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাযিলকৃত। এতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা কিংবা জটিলতা নেই। বরং এতে খুবই সহজ, সরল ও স্পষ্ট ভাষায় নানা বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। অতিসাধারণ মানুষও এ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আল কুরআন ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। মানব জাতির জীবন পরিচালনার মূলনীতি ও নির্দেশনা এতে বিদ্যমান। পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহের মূল শিক্ষাও এতে বর্ণিত রয়েছে। এটি কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী বা দেশের জন্য অবতীর্ণ হয়নি, বরং এটি সর্বকালের সকল মানুষের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

আল-কুরআনের গুরুত্ব

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানব জাতির হেদায়াতের প্রধান উৎস। এতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়, তাঁর গুণাবলির বর্ণনা, তাঁর ক্ষমতা ও নিয়ামতসমূহের বর্ণনা। আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আসমান-জমিন, সৌরজগৎ, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়, পর্বত, সাগর-মহাসাগর সবকিছু সম্পর্কেই এতে উল্লেখ করা হয়েছে। মানবজাতির স্বভাব-প্রকৃতি, আত্মিক উৎকর্ষ ও নৈতিক অধঃপতন ও এর পরিণতির কথা এতে বিধৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা, নবি-রাসুলগণের বিবরণ, পুণ্যবান ও পাপীদের অবস্থা এবং ইহ-পরকালের নানান অদৃশ্য ও অজানা বিষয় এ মহাগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাই আল-কুরআন বহুবিধ জ্ঞানের ভান্ডার এবং মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড।

আল-কুরআনে মানব জাতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিধিবিধান ও আইনকানুন বর্ণিত হয়েছে। কীভাবে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করবে এর দিকনির্দেশনাও আল-কুরআনে বর্ণিত আছে। এটি মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা চিরসত্য ও সুন্দর পথে পরিচালিত করে। এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ, অমূল্য ও অদ্বিতীয় সম্পদ। এর গুরুত্ব বর্ণনায় মহানবি (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এই কুরআন আল্লাহর রজ্জু (রশি), অতি উজ্জ্বল আলো এবং উপকারী মহৌষধ। যে ব্যক্তি (কুরআন) দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে তার জন্য এটা মুক্তির সনদ হবে এবং যে এটা মেনে চলবে সে নাজাত পাবে (কানজুল উম্মাল)।

কুরআন তিলাওয়াত (تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ)

তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, পড়া, আবৃত্তি করা ইত্যাদি। আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামের পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াত বলে। আল-কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। সুতরাং একে আরবিতেই পড়তে হবে। তোমরা যেমন বাংলা ও ইংরেজি পড়তে শিখেছ, তেমনি আরবি পড়াও শিখতে হবে। এজন্য আরবি হরফ বা বর্ণসমূহ চিনতে হবে, আরবি শব্দ ও বাক্য পড়া জানতে হবে, সাথে তাজবিদের কিছু নিয়ম-কানুনও শিখতে হবে। তাজবিদ হচ্ছে আল-কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম-পদ্ধতি। এভাবে আরবিতে সুন্দর করে স্পষ্ট উচ্চারণে আল কুরআন পাঠ করাকে কুরআন তিলাওয়াত বলে।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

আল-কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব অনেক। এটি মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। এতে মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত বেশি বেশি কুরআন

তিলাওয়াত করা। কুরআন তিলাওয়াত করলে আমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানতে পারব ও সে অনুযায়ী আমল করতে পারব। আমরা বুঝে বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করার চেষ্টা করব যাতে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারি।

আমাদের প্রিয়নবি (সা.) এবং তাঁর সাহাবিগণ প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতেন। কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা সালাতে কুরআন পড়তে হয়। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। অশুদ্ধ উচ্চারণে তিলাওয়াত করলে কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। কুরআন স্বয়ং অশুদ্ধ তিলাওয়াতের জন্য অভিশাপ দেয়। সুতরাং আমরা গুরুত্ব সহকারে শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত শিখব, প্রতিদিন তিলাওয়াত করব এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কী বলেছেন তা বুঝার চেষ্টা করবো ।

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

কুরআন তিলাওয়াতের মাহাত্ম্য অনেক বেশি। কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা হলো উত্তম ইবাদাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা, কুরআন কিয়ামত দিবসে পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে।' (মুসলিম)

কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। যে ঘরে কুরআন পড়া হয় সে ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ (অক্ষর) তিলাওয়াতের জন্য দশটি করে সওয়াব লেখা হয়।' (মুসনাদ আহমাদ)

কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত পুণ্যময় ও তাৎপর্যপূর্ণ কাজ। সুতরাং আমরা সবাই সাধ্যমত নিয়মিতভাবে কুরআন তিলাওয়াত করব এবং অন্যদেরকেও কুরআন তিলাওয়াতে উৎসাহিত করব।

নাযিরা তিলাওয়াত

কুরআন মাজিদ দেখে দেখে অথবা মুখস্থ যেভাবেই পাঠ করা হোক তাতে সাওয়াব রয়েছে। তাই সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।' (বুখারি) রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত সুন্দর সুমধুর স্বরে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমরাও শুদ্ধ এবং সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করব।

তাজবিদ

তাজবিদের পরিচয়

তাজবিদ শব্দের অর্থ– উত্তম বা সুন্দর করা। আল কুরআনকে সহিহ-শুদ্ধরূপে পড়ার জন্য বেশকিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। এসব নিয়ম-কানুনসহ আল-কুরআনকে শুদ্ধরূপে সুন্দর করে পাঠ করাকে তাজবিদ বলে। আরবি

হরফসমূহ বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন কণ্ঠনালির নিম্নভাগ থেকে উচ্চারিত হামযা (ء) ও হা (ه)। কণ্ঠনালির মধ্যখান থেকে উচ্চারিত হয় আইন (ع) ও হা (ح)। এরকম আরবি হরফসমূহ উচ্চারিত হওয়ার স্থানকে মাখরাজ বলে।

এছাড়া আরবি হরফ কোনোটি মোটা করে পড়তে হয়, আবার কোনোটি চিকন করে পড়তে হয়। উচ্চারণের এ বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় সিফাত। যেমন: ت (তা) এবং ط (ত্ব) হরফ দু'টির উচ্চারণের স্থান একই। কিন্তু এদের সিফাত ভিন্ন। এ দুটো হরফের মধ্যে ط (ত্ব) কে মোটা করে পড়তে হয় আর ت (তা) কে চিকন করে পড়তে হয়। এভাবে মাখরাজ, সিফাত ও আরও কিছু নিয়ম-কানুন ঠিক রেখে সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করাই তাজবিদ।

তাজবিদের গুরুত্ব

তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ওয়াজিব বা আবশ্যক। তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে গুনাহ হয়। এতে অনেক সময় আল-কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর অশুদ্ধ তিলাওয়াতের ফলে সালাতও পূর্ণাঙ্গ হয় না। যেমন: সূরা ইখলাসে এসেছে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ বলুন (হে নবি)! তিনি আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। এখানে قُلْ শব্দের অর্থ বলুন। আর যদি ق (ক্বাফ) কে ভুল মাখরাজ থেকে উচ্চরণ করে বলা হয় كُلْ তাহলে এর অর্থ হয় খাও বা ভক্ষণ কর। ফলে আল-কুরআনের অর্থের বিকৃতি ঘটে। যা কোনোভাবেই বৈধ নয়। তাজবিদ সহকারে শুদ্ধ ও সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

অর্থ: 'কুরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।' (সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত : ৪)

মহান আল্লাহ তাজবিদ সহকারে কুরআন পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন পাঠ করার অনেক ফজিলত বা মাহাত্ম্য রয়েছে। প্রিয়নবি (সা.) বলেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।' (বুখারি)

সুতরাং আমরা তাজবিদ সহকারে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করব।

মাখরাজ (مَخْرَجٌ)

প্রিয় শিক্ষার্থী, কুরআনকে সহিহ-শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করার জন্য যে কয়টি নিয়ম জানা খুবই জরুরি, তার মধ্যে মাখরাজ অন্যতম। মাখরাজ শব্দটি আরবি। শব্দগত দিক থেকে অর্থ হলো– বের হওয়ার স্থান, উচ্চারণের স্থান।

পরিভাষায় আরবি হরফ (বর্ণ) সমূহের উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। আরবি ভাষায় মোট হরফ রয়েছে ২৯টি। এগুলো ১৭টি মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এই ১৭টি মাখরাজ আবার মুখের ৫টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। মুখের যে স্থানগুলো উচ্চারণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা হলো:

মুখের স্থান	মাখরাজ সংখ্যা
১. জাওফ বা মুখের খালি জায়গা	০১টি
২. হলক বা কণ্ঠনালি	০৩টি
৩. জিহ্বা	১০টি
৪. উভয় ঠোঁট	০২টি
৫. নাসিকামূল	০১টি

মাখরাজের বিবরণ

এক নম্বর মাখরাজ: জাওফ অর্থাৎ মুখের ভিতরের খালি জায়গা। এ স্থান থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যথা:

ক. আলিফ (ا) যখন এর পূর্বের হরফে যবর থাকে। যেমন: بَا

খ. জযম বিশিষ্ট ওয়াও (و) যখন এর পূর্বের হরফে পেশ হয়। যেমন : بُوْ

গ. জযম বিশিষ্ট ইয়া (ي) যখন এর পূর্বের হরফে যের হয়। যেমন : بِيْ

দুই নম্বর মাখরাজ: কণ্ঠনালির নিম্নভাগ থেকে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়। এ দুটি হলো হামযা (ء) ও হা (ه)। যেমন: اَ – هَ

তিন নম্বর মাখরাজ: কণ্ঠনালির মধ্যখান হতে (ح) ও (ع) এ দুটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন: أَحْ–أَعْ

চার নম্বর মাখরাজ: কণ্ঠনালির উপরিভাগ থেকে উচ্চারিত হয় দুটি হরফ। এ দুটি হলো খা (خ) ও গাইন (غ)। যেমন: اَغْ – اَخْ

পাঁচ নম্বর মাখরাজ: জিহবার গোড়া এবং তার বরাবর উপরের তালু। এ স্থান থেকে একটি হরফ উচ্চারিত হয়। এটি হলো ক্বাফ (ق)। যেমন: اَقْ

ছয় নম্বর মাখরাজ: জিহবার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে (ك) উচ্চারণ করতে হয়। যেমন: اَكْ

সাত নম্বর মাখরাজ: জিহবার মধ্যভাগ এবং এর সোজা উপরের তালু। এ মাখরাজ থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। এগুলো হলো - জিম (ج), শিন (ش), ইয়া (ي)। যেমন: **أَيْ– أَشْ– أَجْ**

আট নম্বর মাখরাজ: জিহবার পার্শ্বভাগ ও উপরের পাটির দাঁতের মাড়ি। এ দুই-এর সংযোগে উচ্চারিত হয় দোয়াদ (ض) হরফটি। যেমন: **أَضْ**

নয় নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগের পাশ ও সামনের উপরের দাঁতের গোড়ার দিকের তালুর সাথে মিলে উচ্চারিত হয় একটি হরফ। এটি হলো- লাম (ل) । যেমন: **أَلْ**

দশ নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগ ও তার বরাবর উপরের তালু। এ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় নুন (ن) হরফ। যেমন: **أَنْ**

এগারো নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগের পিঠ এবং সোজা উপরের তালু। এখান থেকে উচ্চারিত হয় রা (ر)। যেমন: أَرْ

বারো নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগ এবং সামনের উপরের দাঁতের গোড়া। এখান থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি হরফ। এগুলো হলো তা (ت), দাল (د), ত্ব (ط)। যেমন: **أَتْ- أَدْ- أَطْ**

তেরো নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগ ও সামনের নিচের দুই দাঁতের মাথা এবং উপরের দাঁতের সামান্য অংশ মিলে উচ্চারিত হয় মোট তিনটি হরফ। এগুলো হলো যা (ز), সিন (س), সোয়াদ (ص) যেমন: **أَزْ- أَسْ- أَصْ**

চৌদ্দ নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগ ও সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের মাথা। এখান থেকে উচ্চারিত হয় ছা (ث), যাল (ذ), যোয়া (ظ)। যেমন: **أَثْ- أَظْ - أَذْ**

পনেরো নম্বর মাখরাজ: নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ বা ভিজা অংশ এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের মাথা। এ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় ফা (ف)। যেমন: **أَفْ**

ষোল নম্বর মাখরাজ: দুই ঠোঁট। এখান থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি হরফ। যথা –

১. বা (ب) উচ্চারিত হয় নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ থেকে। যেমন: **بْأَ**
২. মীম (م) উচ্চারিত হয় ঠোঁটের বাইরের বা শুষ্ক অংশ থেকে। যেমন: **مْأَ**
৩. ওয়াও (و) এ হরফ উচ্চারণে দুই ঠোঁট সরাসরি মিলিত হয় না। বরং উভয় ঠোঁট ডান ও বাশ পাশ থেকে গোল হয়ে অর্ধফোটা ফুলের মতো মধ্যস্থলে ছিদ্র রেখে উচ্চারিত হয়। যেমন: **وْأَ**

সতেরো নম্বর মাখরাজ: নাসিকামূল। এখান থেকে গুন্নাহসমূহ উচ্চারিত হয়। যেমন: জযমযুক্ত নুনকে কখনো কখনো গোপন করে নাসিকামূল থেকে উচ্চারণ করা হয়। তাশদিদযুক্ত নুনের মাখরাজও এটিই। যেমন: **مِنْ شَرِّ- إِنَّ**

আল-কুরআনের কতিপয় সূরা

সূরা আল-ফাতিহা (سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ)

পরিচয়

আল-ফাতিহা কুরআন মাজিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এটি কুরআন মাজিদের সর্বপ্রথম সূরা। ফাতিহা অর্থ সূচনা, শুরু, আরম্ভ, ভূমিকা, মুখবন্ধ ও উপক্রমণিকা। যেহেতু এ সূরা কুরআন মাজিদের শুরুতে অবস্থিত, সে জন্য এ সূরার নাম করণ করা হয়েছে আল-ফাতিহা। এ সূরা দ্বারাই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত সালাত শুরু করা হয়। এটি কুরআন মাজিদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাযিলকৃত সূরা। এটিকে ফাতিহাতুল কিতাব বা ফাতিহাতুল কুরআনও বলা হয়। যার অর্থ কিতাব বা কুরআনের সূচনা বা ভূমিকা।

এটি একটি মাক্কি সূরা। মহানবি (সা.) এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে এটি নাযিল হয়। এ সূরার আয়াত সংখ্যা সাতটি। অন্যান্য সূরার ন্যায় এ সূরার নাম মাত্র একটি নয় বরং এটির অনেকগুলো নাম রয়েছে। এমনকি অনেকে এ সূরার পঁচিশটি পর্যন্ত নাম উল্লেখ করেছেন। এ নামগুলোর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

১. **উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল):** আরবিতে উম্ম অর্থ মা বা মূল। এ সূরাটির ভেতর সমগ্র কুরআনের মূল আলোচনা সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে বিধায় এটিকে উম্মুল কুরআন বলা হয়।

২. **সূরাতুল হামদ (প্রশংসার সূরা):** এ সূরায় মহান আল্লাহর উচ্চ প্রশংসা করা হয়। সেজন্য এ সূরার নাম সূরাতুল হামদ।

৩. **সূরাতুস সালাত (নামাযের সূরা):** প্রত্যেক সালাতে এ সূরা পাঠ করা অপরিহার্য। এটি ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হয়না। তাই এটিকে সূরাতুস সালাত বলা হয়।

৪. **সূরাতুশ শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সূরা):** এ সূরার মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও দয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাই এটিকে সূরাতুশ শোকর বলা হয়।

৫. **সূরাতুদ দোয়া (দোয়া বা প্রার্থনামূলক সূরা):** এ সূরার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়। এ জন্য এ সূরার আর এক নাম সূরাতুদ দোয়া।

৬. **আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি):** সমগ্র কুরআনে যে পরিপূর্ণ জীবন বিধান উপস্থাপন করা হয়েছে তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এ সূরায় বর্ণিত কয়েকটি বাণীর উপর। তাই এটিকে আসাসুল কুরআন বা কুরআনের ভিত্তি বলা হয়।

৭. **সূরাতুশ শিফা (রোগমুক্তির সূরা):** এ সূরার প্রভাবে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। তাই এ নামকরণ করা হয়।

৮. **আস-সাবউল মাছানী (নিত্য পাঠ্য সাতটি আয়াত):** সূরা আল-ফাতিহাতে সাতটি আয়াত রয়েছে এবং তা নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে পাঠ করা হয় বলে এর নাম আস-সাবউল মাছানী।

শব্দার্থ

اَلْحَمْدُ	সমস্ত প্রশংসা	نَعْبُدُ	আমরা ইবাদাত করি
لِلّٰهِ	আল্লাহর জন্য	نَسْتَعِيْنُ	আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি
رَبِّ	প্রতিপালক, স্রষ্টা, রব	اِهْدِنَا	আমাদেরকে পথ দেখাও
اَلْعٰلَمِيْنَ	জগৎসমূহ, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ	اَلصِّرَاطَ	পথ, রাস্তা
اَلرَّحْمٰنِ	পরম দয়াময়	اَلْمُسْتَقِيْمَ	সহজ, সরল, সোজা
اَلرَّحِيْمِ	পরম দয়ালু	اَلَّذِيْنَ	যারা/যাদের
مٰلِكِ	মালিক, অধিপতি	اَنْعَمْتَ	তুমি অনুগ্রহ করেছ
يَوْمِ الدِّيْنِ	বিচার দিবস, কর্মফল দিবস, প্রতিদান দিবস	اَلْمَغْضُوْبِ	ক্রোধে-নিপতিত
اِيَّاكَ	শুধু আপনারই/ শুধু তোমারই	اَلضَّآلِّيْنَ	পথভ্রষ্ট

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝	সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝	যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝	যিনি বিচার দিনের মালিক।

اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ۝	আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۝	আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর,
صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۝	তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ,
غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ۝	তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

ব্যাখ্যা

কুরআন মাজিদের সবচেয়ে বরকতপূর্ণ সূরা হচ্ছে আল-ফাতিহা। এ সূরায় সমগ্র কুরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কুরআনে ইমান ও নেক আমলের আলোচনা করা হয়েছে। আর এ সূরায় উক্ত মূলনীতি দুটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরাটি মূলত আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম। এর প্রথম তিনটি আয়াতে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর শেষ তিন আয়াতে মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহর নিকট মুনাজাত, প্রার্থনা ও মনের পরম আকুতি-মিনতি জানানো হয়েছে। আর মধ্যের একটি আয়াতে একত্রিতভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহ বলেন, 'সুরাতুল ফাতিহা আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায় তা তাদেরকে দেওয়া হবে।' (মুসলিম)

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিযিকদাতা। তিনি সারা জাহানের মালিক। জগতের সব কিছু তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার মুখাপেক্ষী। তাঁর অসংখ্য নেয়ামত আমরা প্রতিনিয়ত ভোগ করি। তাই সর্বদা তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য। তিনিই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। তিনি দুনিয়ার সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালনকারী। তিনি শুধু ইহকালের মালিক নন পরকালেরও মালিক। পরকালের হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নাম সবকিছুই তাঁর অধীন। শেষ বিচারের কালে তিনিই একমাত্র বিচারক। জ্বিন-ইনসানের কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিবেন তিনিই। অতঃপর পুণ্যবানদের তিনি পুরস্কারস্বরূপ দিবেন জান্নাতের অনাবিল সুখ শান্তি আর পাপীদের দিবেন জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি। এদিনের নিরঙ্কুশ মালিকানা কেবল তাঁরই। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর নিকট সুপারিশও করতে পারবে না। তিনি ইচ্ছা করলে কোনো বান্দাকে বিনা হিসাবেও জান্নাত দিতে পারেন। তাই সকল প্রশংসা ও ইবাদাতের শুধু তাঁরই প্রাপ্য। এতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সুরা ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াতে মহান আল্লাহর অসীম কুদরত ও একচ্ছত্র ক্ষমতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

মানুষ কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করবে এবং শুধু তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। সকল ব্যাপারে শুধু তারই উপরে ভরসা করবে। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। এসব কথা বলা হয়েছে সূরাটির মধ্যবর্তী আয়াতে।

মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের ভাল-মন্দ তাঁরই হাতে। কিসে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ এবং কিসে অকল্যাণ তা এক মাত্র আল্লাহই জানেন। সত্য-ন্যায় ও হেদায়াতের পথ কোনটি তা শুধু তিনিই জানেন। তিনিই সত্য ও সঠিক পথের মালিক। মানুষ মহান আল্লাহর নিকটই সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রার্থনা করে। মহান আল্লাহর নিকট কিভাবে প্রার্থনা ও মুনাজাত করতে হয় তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এ সূরার শেষ তিনটি আয়াতে। মানুষের উচিত আল্লাহর নিকট সত্য, সুন্দর ও সরল-সঠিক পথের প্রার্থনা করা, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ যে পথে চলেছেন, নবি রাসুলগণ ও সত্যবাদীগণ যে পথ অনুসরণ করেছেন সে পথের দিশা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর নিকট বিনীতভাবে মুনাজাত করা। অনুরূপভাবে যে পথে চলে মানুষ অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে যেমন ইয়াহুদি, নাসারাদের অনুসৃত পথ, তা থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

শিক্ষা

সূরা ফাতিহা মহান আল্লাহর সাথে বান্দার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। বান্দা প্রতিনিয়ত সালাতে এ সূরা পাঠ করে মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের মালিক। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। বিচার দিনের অধিপতি। যাবতীয় প্রশংসা ও ইবাদাত বন্দেগীর একমাত্র প্রাপ্য তিনি। তিনি সকল সৃষ্টির লালন-পালনকারী। তিনিই মানবজাতিকে সত্য-সুন্দর ও সরল-সঠিক পথের দিশা দেন। মানুষের উচিত একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা এবং তারই কাছে যাবতীয় বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা । নবি-রাসুল ও আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের পথ অনুসরণের তাওফিক কামনা করা। আর পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত ইয়াহুদি-নাসারাদের পথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

সূরা আন-নাস (سُوْرَةُ النَّاسِ)

পরিচয়

কুরআন মাজিদের সর্বশেষ সূরা হলো সূরা আন-নাস। এই সূরাটি কুরআন মাজিদের ১১৪ তম সূরা। সূরাটি সপ্তম হিজরিতে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আন-নাস এর আয়াত সংখ্যা ৬টি। সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরায় ব্যবহৃত النَّاسِ (আন-নাস) শব্দ দ্বারা। অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে কীভাবে বাঁচা যাবে তা-ই এ সূরার আলোচ্য বিষয়।

শব্দার্থ

قُلْ	আপনি বলুন, তুমি বলো	شَرِّ	অকল্যাণ, অনিষ্ট, ক্ষতি
اَعُوْذُ	আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি আশ্রয় চাই, আমি সাহায্য চাই	اَلْوَسْوَاسِ	কুমন্ত্রণাদাতা, খারাপ কাজের পরামর্শদাতা
رَبِّ	প্রতিপালক, পালনকারী, রব	اَلْخَنَّاسِ	আত্মগোপনকারী, যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে
اَلنَّاسِ	মানুষ, মানবজাতি	الَّذِيْ	যে
مَلِكِ	মালিক, অধিপতি	يُوَسْوِسُ	যে কুমন্ত্রণা দেয়
اِلٰهِ	ইলাহ, মাবুদ, উপাস্য	صُدُوْرِ	বক্ষসমূহ, অন্তরসমূহ
مِنْ	হতে, থেকে	اَلْجِنَّةِ	জিন

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ	বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের,
مَلِكِ النَّاسِ ۙ	মানুষের অধিপতির,
اِلٰهِ النَّاسِ ۙ	মানুষের ইলাহ এর নিকট।
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ	আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতা অনিষ্ট থেকে,
الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ	যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ	জিন এবং মানুষের মধ্য থেকে।

ব্যাখ্যা

পবিত্র কুরআন মাজিদের সূচনা হয়েছিল সূরা আল-ফাতিহার মাধ্যমে। সেটিতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণাবলি উল্লেখ করে তাঁর কাছে সরল পথের হেদায়াত দান করার জন্য দোয়া করা হয়। কিন্তু সরল পথে চলার ক্ষেত্রে শয়তানের পক্ষ থেকে অনেক বাধা এবং কুমন্ত্রণা আসতে পারে। তাই কুরআন মাজিদের সর্বশেষ সূরায় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে আমরা শয়তানের অনিষ্ট ও ধোঁকা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি।

সূরা আন-নাস এর প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার তিনটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো, প্রতিপালক, মালিক, উপাস্য। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি গুণ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো সত্তার জন্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি উল্লেখ করে, তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি করে তাঁর কাছে অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকা ও অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। মানুষ নিজের ক্ষমতা ও শক্তিতে শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য থাকলেই শয়তানের ধোঁকা ও অনিষ্ট থেকে বাঁচা সম্ভব। মহানবি (সা.) বলেন- 'কোনো শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, শয়তান তার অন্তরে চেপে বসে থাকে। বড় হয়ে সে যদি আল্লাহর স্মরণ (যিকির) করে তাহলে শয়তান অদৃশ্য হয়ে যায়। আর যদি আল্লাহর স্মরণ না করে তাহলে সে তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।'

মানুষকে কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান দুই ধরনের। এক প্রকার শয়তানকে দেখা যায় না। তারা অদৃশ্য হয়ে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। তারা জিন শয়তান। আর অন্য প্রকার রয়েছে মানুষের মাঝে। মানুষ শয়তানও মানুষকে খারাপ কাজ করতে উৎসাহ যোগায় ও ধোঁকা দেয়। উভয় ধরনের শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখে। আল্লাহর ইবাদাত থেকে ফিরিয়ে রাখে। ভালো কাজ করতে বাধা প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচা যায় না। তাই সূরা আন-নাস এ এই দুই প্রকার শয়তান থেকেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা

পৃথিবীতে আমরা এসেছি আল্লাহর আনুগত্য এবং ইবাদাত করার জন্য। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা। তিনি আমাদের মালিক। তিনিই ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য। কিন্তু শয়তান আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য কুমন্ত্রণা দেয়। আমাদেরকে খারাপ পথে নিয়ে যেতে চায়। আমরা যদি আল্লাহর স্মরণ করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি তাহলে শয়তান আমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারবে না। আমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

সূরা আল-ফালাক (سُوْرَةُ الْفَلَقِ)

পরিচয়

সূরা আল-ফালাক পবিত্র কুরআন মাজিদের ১১৩ নম্বর সূরা। এই সূরার আয়াত সংখ্যা ৫টি। সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় ব্যবহৃত আল-ফালাক (اَلْفَلَق) শব্দ থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা আল-ফালাক এবং সূরা আন-নাস এর মাঝে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এই সূরা দুটি একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, লাবিদ ইবন আসিম নামক এক ইয়াহুদি তার কন্যার মাধ্যমে মহানবি (সা.) এর উপর যাদু করেছিল। তারা গোপনে মহানবি (সা.) এর একটি চুল সংগ্রহ করে তাতে এগারোটি গিরা দিয়ে যাদু করে। মহানবি (সা.) যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং খুব কষ্ট পান। তখন আল্লাহ তা'আলা এই সূরা দুটি একসঙ্গে অবতীর্ণ করেন। মহানবি (সা.) কে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তিনি সূরা দুটির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে যাদু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সূরা দুটিতে মোট এগারোটি আয়াত রয়েছে। এক একটি আয়াত পাঠ করে গিরাতে ফুঁক দিলে যাদুর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। মহানবি (সা.) যাদুর ক্রিয়া থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান।

হাদিসে আছে- এই সূরা দুটি পড়ে ফুঁক দিলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। আর যে নিয়মিত সূরা দুটি পাঠ করে তাকে কোনো যাদু ক্ষতি করতে পারে না। মহানবি (সা.) রাতে ঘুমানোর সময় সূরা দুটি পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে পুরো শরীর মুছে নিতেন।

শব্দার্থ

قُلْ	তুমি বলো, আপনি বলুন	اِذَا	যখন
رَبُّ	প্রতিপালক, স্রষ্টা, রব	وَقَبَ	আচ্ছন্ন হলো, গভীর হলো
اَلْفَلَقُ	ভোর, প্রভাত, ঊষা, সকাল	اَلنَّفّٰثٰتُ	ফুঁকদানকারী নারীগণ
مِنْ	থেকে, হতে	الْعُقَدُ	গ্রন্থিসমূহ, গিরাসমূহ
شَرُّ	অনিষ্ট, ক্ষতি	فِي	মধ্যে,ভিতরে
خَلَقَ	তিনি সৃষ্টি করেছেন	حَاسِدٌ	হিংসাকারী, হিংসুক
غَاسِقٌ	রাতের অন্ধকার	حَسَدَ	সে হিংসা করল, সে ঈর্ষা করল

অনুবাদ

আয়াত	অনুবাদ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ	বলুন, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের পালনকর্তার,
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ	তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে,
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ	রাতের আঁধারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়,
وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ	এবং অনিষ্ট থেকে ঐ সমস্ত নারীদের, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۧ	এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-ফালাক এবং সূরা আন-নাস সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম। এই সূরা দুটিতে কীভাবে বিভিন্ন ক্ষতিকর জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে তা শেখানো হয়েছে। সূরা আন-নাস এ বিশেষভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। আর সূরা আল-ফালাকে শেখানো হয়েছে বিভিন্ন মাখলুকের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়। আকাশ এবং পৃথিবীর সবকিছুই মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। কোনো কিছুই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির পিছনেই রয়েছে হিকমত এবং কল্যাণ।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কিছু ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেন বান্দা সেসবের ক্ষতির ভয়ে পৃথিবীর সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এই সূরায় অন্ধকার রাতের বিপদ থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। কারণ রাতের অন্ধকারেই অধিকাংশ খারাপ কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। আর যাদুকররা তাদের ক্ষতিকর যাদুর কাজ সাধারণত রাতের বেলায় করে থাকে। সূরার চার নং আয়াতে নারী যাদুকরের কথা বলা হলেও এখানে নারী ও পুরুষ উভয় প্রকার যাদুকর উদ্দেশ্য। কারণ যাদুকর পুরুষ হতে পারে আবার মহিলাও হতে পারে। উভয় প্রকার যাদুকরের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও সূরার শেষ আয়াতে হিংসুকের হিংসা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। সূরা আল-ফালাক এবং সূরা আন-নাস পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিলে আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের অনিষ্ট থেকে মানুষকে আশ্রয় প্রদান করেন।

শিক্ষা

পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, ক্ষতিকর, উপকারী সবকিছুর স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলা। সবই তাঁর অধীন। তাই এসবের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এবং এগুলোর উপকার লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

সূরা আল-ইখলাস (سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ)

পরিচয়

সূরা আল-ইখলাস আল-কুরআনের একটি ছোট সূরা; কিন্তু এর ফযিলত ও তাৎপর্য অত্যন্ত বেশি। এটি আল-কুরআনের ১১২তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৪টি। এ সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে নাযিল হয়। এর ফযিলত সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেছেন, এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারি ও মুসলিম) অন্য এক হাদিসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসুল (সা.) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। উত্তরে নবি করিম (সা.) বললেন, এর ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (তিরমিযি) অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে, তা তাকে বালা-মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট। (আবু দাউদ)

শানে নুযূল

মক্কার মুশরিকরা মূর্তিপূজা করত এবং তারা আল্লাহর পরিচয় জেনেও শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। একবার তারা মহানবি (সা.) এর নিকট আল্লাহ তা'আলার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ সূরা নাযিল করেন। (তিরমিযি)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল, আল্লাহ তা'আলা কিসের তৈরি- স্বর্ণ, রৌপ্য না অন্য কিছুর? তাদের এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ সূরা নাযিল করেন।

শব্দার্থ

قُلْ	তুমি বলো, আপনি বলুন	لَمْ يَلِدْ	তিনি কাউকে জন্ম দেননি
هُوَ	তিনি, সে	لَمْ يُوْلَدْ	তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি
اَحَدٌ	একক, এক-অদ্বিতীয়	كُفُوًا	সমতুল্য, সাদৃশ্যপূর্ণ, সমকক্ষ
اَلصَّمَدُ	অমুখাপেক্ষী, যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ংসম্পূর্ণ		

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়,পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ	বলুন, (হে নবি!) তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।
اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ	আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, (সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)।
لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ	তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ	আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

ব্যাখ্যা

এ সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলার তাওহিদ বা একত্ববাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মুশরিক ও কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের জবাব দেওয়া হয়েছে। সূরাটিতে সংক্ষিপ্তরূপে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবকিছু তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন এবং একাই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। বরং সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তাঁর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। যারা আল্লাহর বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁরও কোনো সন্তান নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। বিশ্বজগতে কেউ তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। আমরা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করব। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করব না। এই সূরাটিকে ভালোবাসব এবং বেশি বেশি তিলাওয়াত করার চেষ্টা করব।

শিক্ষা

- আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়।
- সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।
- তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতাপিতা কেউই নেই।
- তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান।
- তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা আল-হুমাযাহ (سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ)

পরিচয়

সূরা আল-হুমাযাহ আল কুরআনের ১০৪তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৯টি। এ সূরাটি পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। হুমাযাহ শব্দের অর্থ পশ্চাতে নিন্দাকারী। এ সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ 'হুমাযাহ' অনুসারে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরাটিতে তিনটি জঘন্য গুনাহ ও তার শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গুনাহ তিনটি হল গিবত, সামনাসামনি মন্দ বলা ও অর্থলিপ্সা। আমরা এ সূরাটি অর্থসহ মুখস্থ করব এবং এ সূরার শিক্ষা অনুযায়ী আমল করব।

শানে নুযুল

উমাইয়া ইবনে খালফ, ওলীদ ইবনে মুগিরা ও আখনাস ইবনে শুরায়ক মহানবি (সা.) ও মু'মিনদের গিবত করত এবং তাদের অর্থলিপ্সা ছিল প্রবল। তাদের এই অপকর্মের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ এই সূরা অবতীর্ণ করেন।

শব্দার্থ

وَيْلٌ	দুর্ভোগ, ধ্বংস	لَيُنْۢبَذَنَّ	অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে
لِكُلِّ	প্রত্যেকের জন্য/ সকলের জন্য	اَلْحُطَمَةُ	হুতামাহ, একটি জাহান্নামের নাম
هُمَزَةٌ	পশ্চাতে নিন্দাকারী	مَآ اَدْرٰىكَ	আপনি কি জানেন?
لُمَزَةٌ	সম্মুখে নিন্দাকারী	نَارُ	আগুন
جَمَعَ	সে জমা বা একত্র করেছে, সে সঞ্চয় করেছে	اَلْمُوْقَدَةُ	প্রজ্বলিত
مَالًا	মাল, ধন-সম্পদ	تَطَّلِعُ	তা গ্রাস করবে
عَدَّدَهٗ	সে তা বারবার গণনা করেছে	اَلْاَفْـِٕدَةُ	হৃদয়সমূহ, অন্তরসমূহ
يَحْسَبُ	সে ধারণা করে, সে হিসাব করে	مُّؤْصَدَةٌ	পরিবেষ্টিত
اَخْلَدَهٗ	তা তাকে অমর করেছে, তা চিরস্থায়ী করেছে	عَمَدٌ	স্তম্ভসমূহ, খুঁটিসমূহ
كَلَّا	কখনো নয়	مُّمَدَّدَةٌ	দীর্ঘায়িত, প্রলম্বিত

অনুবাদ

আয়াত	অনুবাদ
بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۣ ۙ	দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।
الَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ	যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে।
يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ ۚ	সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।
كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ ۖ	কখনো না; সে অবশ্যই হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।
وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحُطَمَةُ ؕ	আর আপনি কি জানেন, হুতামাহ কী?
نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ ۙ	এটি আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন।
الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـِٕدَةِ ؕ	যা অন্তরসমূহ গ্রাস করবে।
اِنَّهَا عَلَيۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ ۙ	নিশ্চয়ই এটি তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে।
فِىۡ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۚ	দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-হুমাযাহকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম তিন আয়াত নিয়ে প্রথম অংশ এবং শেষ ছয়টি আয়াত নিয়ে দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে তিনটি জঘন্য গুনাহের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে এসব গুনাহের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

এ সূরায় বর্ণিত গুনাহ বা পাপ কাজগুলো হলো:

ক. পশ্চাতে বা গোপনে কারও নিন্দা করা। একে গিবতও বলা হয়। এটি অত্যন্ত খারাপ কাজ। আল্লাহ তা‘আলা আল কুরআনের অন্য আয়াতে গিবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমান বলে উল্লেখ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক।’ (বায়হাকি)

খ. সামনাসামনি কারও নিন্দা করা। এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। এর কষ্টও বেশি, ফলে শাস্তিও গুরুতর। অনেক সময় এ কারণে সমাজে ঝগড়া, মারামারি ও গন্ডগোল সৃষ্টি হয়।

গ. ধন-সম্পদ জমা করা ও বারবার তা গণনা করা। এর দ্বারা অতিশয় অর্থলিপ্সা বোঝানো হয়েছে। ধন-সম্পদের প্রতি অতি লোভ মানুষকে বিপদগামী করে। সে হালাল-হারাম বিবেচনা না করে যে কোনোভাবে অতিমাত্রায় অর্থ উপার্জন করতে থাকে, এভাবে তার সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও মনের দিক থেকে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। গরিব-দুঃখীদের অধিকার আদায় করে না। যাকাত, হজ ইত্যাদি ফরয ইবাদাতও পালন করে না। বরং সে সম্পদ জমা করতে থাকে এবং ধারণা করে যে, এসব ধন-সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত তিনটি জঘন্য কাজের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গিবত, সামনাসামনি মন্দ বলা ও অর্থলিপ্সা- তিনটিই খারাপ কাজ। এগুলো কবিরা গুনাহ। এজন্য আখিরাতে মানুষকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। অর্থ মানুষকে অমর করে রাখবে– এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং সকল মানুষকেই মরতে হবে। তারপর হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের হিসাব নিবেন। যারা দুনিয়াতে এ তিনটি জঘন্য কাজ করে আখিরাতে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের স্থান হবে হুতামাহ নামক জাহান্নামে।

হুতামাহর আগুনে ঐ সকল ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলবে। এমনকি তাদের হৃদয় বা অন্তরও ঐ আগুনে পুড়বে। কোনো কিছুই আগুনের গ্রাস থেকে রেহাই পাবে না। দুনিয়ার আগুন মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত আগুন পৌঁছাবে এবং হৃদয় দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবিত অবস্থাতেই মানুষ সেখানে অনুভব করবে।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি। যেমন:

- পশ্চাতে বা গোপনে কখনো কারও নিন্দা করব না।
- কখনো সামনাসামনি কারও নিন্দা করব না।
- অর্থের প্রতি লোভ করব না। বরং আল্লাহ তা'আলা যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকব এবং প্রয়োজনমতো তা খরচ করব।
- জাহান্নামের শাস্তি অত্যন্ত ভয়ংকর।
- আমরা উল্লিখিত গুনাহসমূহ থেকে দূরে থাকব, যাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাই।

অর্থসহ মুনাজাতের তিনটি আয়াত

আমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এ পৃথিবীতে বেঁচে আছি। প্রতিনিয়ত আমরা আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করি। এসব নেয়ামতের শুকরিয়া করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করলে মহান আল্লাহ অখুশি হন। পার্থিব উপকরণসমূহ পাওয়ার জন্য আমরা অনেক কষ্ট করে থাকি। মহান আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে এগুলো আমাদের দান করেন। দুনিয়া আখিরাতের সমস্ত নেয়ামতের মালিক মহান আল্লাহ। তাই এগুলো অর্জন করোর জন্য তাঁরই নিকটে প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনোকিছু পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করাকে মুনাজাত বলে। মুনাজাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। হাদিসে মুনাজাতকে ইবাদাতের সারবস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মুনাজাতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে মুনাজাতমূলক অনেক আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি মুনাজাতের আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো। আমরা এগুলো শিখব এবং এর অর্থ জানব। এর পর এগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দোয়া করব।

আয়াত-১

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَةً وَّفِی الۡاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতের কল্যাণ দান করুন; আর আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করুন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০১)

প্রত্যেক মুমিন বান্দা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় তাকে জীবিত করা হবে এবং তাঁর কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। মৃত্যুর পরবর্তী এই সময়কে বলা হয় আখিরাত। আখিরাতের সময়কাল পৃথিবীর মতো অস্থায়ী নয়। বরং তা হবে অনন্ত, অসীম যার কোনো শেষ নেই। একজন মানুষের আখিরাত আনন্দময় হবে নাকি কষ্টের হবে তা নির্ভর করে দুনিয়ায় সে কী আমল করেছে তার উপর। কেউ যদি দুনিয়ায় ভালো কাজ করে, আল্লাহর আনুগত্য করে তাহলে তার আখিরাত সুন্দর হবে। অপরদিকে কেউ যদি দুনিয়ায় খারাপ কাজ করে তাহলে তাকে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। পৃথিবী হলো মুমিন বান্দার পরীক্ষার ক্ষেত্র। এজন্য একজন মু'মিনের দুনিয়ার জীবন গুরুত্বপূর্ণ আবার আখিরাতের জীবনও গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা যেন শুধু দুনিয়ার কল্যাণ কামনা না করে। বরং দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও সফলতা চেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে।

আয়াত-২

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি তাঁদের দুজনকে (বাবা ও মা) দয়া করুন। যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৪)

আমরা পৃথিবীতে এসেছি আমাদের বাবা ও মায়ের মাধ্যমে। তাঁরাই আমাদেরকে লালনপালন করে বড় করেছেন। যখন আমরা খুব ছোট ছিলাম, নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারতাম না, নিজেদের হাতে খেতে পারতাম না, তখন মা-বাবা আমাদেরকে প্রতিপালন করেছেন। তাঁরা নিজেরা শত কষ্ট সহ্য করেও আমাদেরকে সুখে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করেছেন। নিজেদের সুখ-শান্তির কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা আমাদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছেন। মা গর্ভধারণের কষ্ট সহ্য করেছেন। বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে আমাদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। এসবের কোনো বিনিময় এবং প্রতিদান দেওয়া আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দোয়াটি শিখিয়ে দিয়েছেন। আমরা যেন এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে মা বাবার জন্য কল্যাণ কামনা করি।

আয়াত-৩

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন।' (সূরা তা-হা, আয়াত: ১১৪)

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অসংখ্য মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। সাগরে প্রকাণ্ড নীল তিমি, স্থলের বিশালদেহী হাতি আরও কত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি যে কত বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু সকল কিছুর উপরে মানুষকেই আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সকল সৃষ্টির উপর মানুষকে মর্যাদা দেওয়ার একটিই কারণ– আর তা হলো মানুষের জ্ঞান ও বিবেক। মানুষ তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে। আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে যা অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মহানবি (সা.) বলেন– সকল মুসলিমের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয। সকল জ্ঞানের মালিক মহান আল্লাহ। তিনিই একমাত্র জ্ঞানদাতা। তিনি যাকে খুশি তা দান করেন। তাই আয়াতে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেন তারা আল্লাহর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মুনাজাত করে। আমরা জ্ঞানার্জনে কোনো অবহেলা করব না। সর্বদা উপকারী জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সকল জ্ঞানের উৎস মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব।

আল-হাদিস (اَلْحَدِيْثُ)

হাদিস আরবি শব্দ। এর অর্থ কথা, বাণী। ইসলামের পরিভাষায় মহানবি (সা.)- এর বাণী, কর্ম ও তাঁর মৌন সম্মতিকে হাদিস বলা হয়। সাহাবিগণ মহানবি (সা.)-এর সামনে ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কিত কোন কথা বলেছেন বা কোনো কাজ করেছেন আর মহানবি (সা.) তা নিষেধ করেননি কিংবা নীরব থেকেছেন এটাকে বলা হয় মৌনসম্মতি।

মহানবি (সা.)-এর জীবদ্দশায় প্রথম দিকে কুরআনের সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কায় হাদিস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। তখন আরবের লোকদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ছিল প্রখর। তাঁরা যা শুনতেন তা-ই তাদের মুখস্থ হয়ে যেত। মহানবি (সা.) তাঁদেরকে হাদিস মুখস্থ করার প্রতি উৎসাহিত করেন। মহানবি (সা.) বলেন– 'ঐ ব্যক্তি ধন্য হবে যে আমার হাদিস শুনবে, সংরক্ষণ করবে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে।'(তিরমিযি) মহানবি (সা.)-এর এ বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহাবিগণ হাদিস মুখস্থ করেন এবং তা যথাযথভাবে অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। মহানবি (সা.)-এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদীন ও উমাইয়া শাসনামলে দীর্ঘদিন এভাবে হাদিস মুখস্থ করে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া সাহাবিগণ হাদিস শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে হাদিসের প্রসার ও প্রচার করেন। বহু দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে তাঁদের নিকট হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো কোনো সাহাবি ও তাবে'ঈ মহানবি (সা.)-এর বহু হাদিস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

হিজরি ১০০ সালে উমাইয়া খলিফা উমর ইবন আবদুল আযীয সরকারিভাবে হাদিস লিখার হুকুম জারি করেন। পরবর্তীকালে হিজরি তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমস্ত হাদিস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এ সময় হাদিসের বেশ কিছু বিশুদ্ধ কিতাব সংকলন করা হয়। এর মধ্যে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এ ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতেও হাদিস সংকলন অব্যাহত থাকে। আর এভাবেই আমরা মহানবি (সা.)-এর হাদিস লাভ করি।

হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মাজিদের পরই সুন্নাহ বা হাদিসের স্থান। কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। এতে ইসলামের আহকাম, মূলনীতি ও নির্দেশাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মহানবি (সা.) প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই হচ্ছে হাদিস। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কুরআন মাজিদে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু দিনে রাতে কত ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে, প্রতি ওয়াক্তে কত রাকাআত পড়তে হবে, কিভাবে রুকু-সিজদাহ করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নেই। অনুরূপভাবে কুরআনে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কত পরিমাণ দিতে

হবে, তার কোনো উল্লেখ কুরআন মাজিদে নেই। আল্লাহর হুকুম অনুসারে মহানবি (সা.) এ গুলোর বিস্তারিত নিয়ম কানুন বর্ণনা করেছেন হাদিসের মাধ্যমে। এ কারণেই কুরআনের ন্যায় হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই কুরআন বুঝতে ও সে অনুসারে আমল করতে হাদিস অপরিহার্য। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ: 'রাসুল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭)

মহানবি (সা.) হাদিসের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'আমি তোমাদের কাছে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এই দুটি আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব আর অন্যটি তাঁর রাসুলের সুন্নাহ।' (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

অর্থসহ নৈতিকগুণাবলি বিষয়ক দুটি হাদিস

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও নির্দেশ যেমন মানুষকে সৎপথের সন্ধান দেয়, তেমনি রাসুলের হাদিসও সমগ্র মানব জাতিকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথে পরিচালিত করে। অতএব আমরা বলতে পারি মানব জীবনে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

কথায় ও কাজে সৎ-সুন্দর ও মার্জিত থাকার নাম নীতি ও নৈতিকতা। মানব জীবনে নীতি ও নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। বলা হয়ে থাকে নীতিহীন মানুষ পশুর সমান। তাকে সকলে ঘৃণা করে। তার সাথে কেউ লেনদেন ও চলাফেরা করে না। সে সমাজে মাথা উঁচু করে বসবাস করতে পারে না। পক্ষান্তরে নীতিবান মানুষকে সকলে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। সকলে তাঁর অনুকরণ করে। সকলে তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম নীতির অধিকারী। কোনো অনিয়ম তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি সর্বদা নীতি ও আদর্শের পরিপূর্ণ অনুশীলন করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র তথা উত্তম নীতি নৈতিকতার পরিপূর্ণতা দানের জন্য। মহানবি (সা.) পবিত্র হাদিসে মানব জাতিকে নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নে নীতি-নৈতিকতামূলক দুটি হাদিস অর্থসহ উল্লেখ করা হলো। আমরা এগুলো শিখব এবং এর শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করব।

হাদিস-১

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ (مُسْنَدُ أَحْمَد)

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করে না, তার ইমান নেই আর যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না তার দ্বীন নেই অর্থাৎ সে প্রকৃত দ্বীনদার নয়।' (মুসনাদ আহমাদ)

শিক্ষা

দুনিয়া এবং আখিরাতে সাফল্য লাভের জন্য একজন মানুষকে ভালো গুণাবলি অর্জন করতে হয়। যে গুণাবলি তাকে আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছে পছন্দনীয় করে তোলে। আমানত রক্ষা করা এবং ওয়াদা পালন করা সেগুলোর মাঝে অন্যতম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আমরা অনেকের সাথে অনেক ওয়াদা করে থাকি। সেই ওয়াদাগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। যদি আমরা ওয়াদা পালন না করি তাহলে মানুষের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে এবং আল্লাহর কাছে আমরা খারাপ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হব। ওয়াদা পালন না করার জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের শাস্তি পেতে হবে।

একইভাবে কেউ যখন আমাদের কাছে কোনো কিছু আমানত রাখবে, আমাদের দায়িত্ব হলো সেই আমানতকে যথাযথভাবে রক্ষা করা। যদি আমানতের খেয়ানত করি অথবা আমানত রক্ষা না করি তাহলে আমাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তাই আমরা ওয়াদা পালন করব এবং আমানত রক্ষা করব। মহানবি (সা.) মানব জাতিকে এই হাদিসের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মুমিন ও দ্বীনদার হওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

হাদিস-২

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ (بُخَارِى وَمُسْلِم)

অর্থ: 'সত্য (মানুষকে) পুণ্যের পথে পরিচালিত করে। আর পুণ্য জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

শিক্ষা

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। প্রকৃত কথা, কাজ, বিষয়, অবস্থা ইত্যাদি গোপন না করে হুবহু প্রকাশ করাকে সত্যবাদিতা বলা হয়। সত্যবাদীকে সকলে পছন্দ করে, ভালোবাসে। সকলে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) সত্যবাদী ছিলেন। তিনি জীবনে কোনো মিথ্যা বলেননি। তিনি মানুষকে সত্য কথা বলা ও সত্যনিষ্ঠ হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা সত্য মানুষকে সকল পাপাচার থেকে বিরত রাখে। সত্যবাদী লোক কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারে না। সর্বদা ভালো কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। ফলে তার ইহকালীন জীবন যেমন সুন্দর ও সার্থক হয় তেমনি আখিরাতে জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে।

যেহেতু সততা মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্যের পথে ধাবিত করে। আর পুণ্য জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সুতরাং আমরা সর্বদা কথা ও কাজে সত্যনিষ্ঠ হবো এবং মিথ্যা পরিহার করব। তাহলেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।

অর্থসহ মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস

মুনাজাত মহান আল্লাহর একটি পছন্দনীয় ইবাদাত। মহান আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্কের সেতুবন্ধন হলো

মুনাজাত। আল্লাহ চান বান্দা যেন মুনাজাতের মাধ্যমে বেশি বেশি তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তিনি বান্দার মুনাজাত কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন-

اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ

অর্থ: 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ৬০)

মহানবি (সা.) উম্মতের মহান শিক্ষক। তিনি বলেন, 'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।' (ইবনে মাজাহ)। তিনি মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। কোন পথের অনুসরণ করলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করতে পারবে তা তিনি হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহর কাছে কীভাবে মুনাজাত করতে হবে তা তিনি উম্মতকে শিখিয়েছেন। অসংখ্য মুনাজাতমূলক হাদিস রয়েছে। এখানে আমরা দুটি মুনাজাতমূলক হাদিস অর্থসহ শিখব এবং এগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট ভক্তিসহকারে মুনাজাত করব।

হাদিস-১

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى، وَالتُّقٰى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنٰى (مُسْلِم)

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি সঠিক পথের দিশা, আল্লাহভীতি, চারিত্রিক নির্মলতা ও স্বচ্ছলতা।' (মুসলিম)

মহানবি (সা.) তাঁর উম্মতকে অসংখ্য দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে তারা আল্লাহর কাছে তাদের প্রার্থনা জানাবে। এই হাদিসটি তার মাঝে অন্যতম। এই হাদিসে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো বান্দা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। প্রথমটি হলো হেদায়াত বা সঠিক, সরল পথের সন্ধান। যে পথে চললে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে তাকওয়ার কথা। তাকওয়া হলো, সকল কাজ আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করা। তৃতীয়ত বলা হয়েছে উত্তম চরিত্রের কথা। উত্তম চরিত্র মানুষের মহামূল্যবান সম্পদ। আর সবশেষে বলা হয়েছে স্বচ্ছলতার কথা। এই চারটি বিষয় যদি কোনো মানুষের মাঝে পাওয়া যায় তাহলে সে ই দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবে।

হাদিস-২

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا (اِبْنُ مَاجَه)

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান এবং পবিত্র রিযিক প্রার্থনা করছি।' (ইবন মাজাহ)

জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু সব ধরনের জ্ঞান দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য উপকারী হয় না। কিছু জ্ঞান অর্জন কেবল সময় নষ্ট ছাড়া কোনো কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে না। এজন্য মহানবি (সা.) আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন যেন আমরা আল্লাহর নিকট উপকারী জ্ঞান চাই। এমন জ্ঞান যা আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। একইসঙ্গে হাদিসে আল্লাহর নিকট পবিত্র রিযিক চাওয়ার শিক্ষা দেওয়া

হয়েছে। কারণ রিযিক পবিত্র না হলে বান্দার কোনো দোয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। তাই আমরা আল্লাহর নিকট উপকারী জ্ঞান এবং পবিত্র রিযিক চাইব যেভাবে হাদিস শরিফে শেখানো হয়েছে।

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় হাদিস

সততা, সত্যবাদিতা, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টি কথা, উন্নত চরিত্র, দয়া-মায়া, ক্ষমা, ভালোবাসা, পরস্পর সহযোগিতা– এ সবকিছুর সমন্বয় হলো নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ। মানুষের জীবন ও সমাজকে সুন্দর করতে হলে এই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অনুসরণ অপরিহার্য। উত্তম চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। তাই আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য এ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি।

একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাল-চলন, উঠা-বসা, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন সবকিছুই যখন প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয় তখন তাকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে। এইরূপ নৈতিকতা ও মানবিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বোত্তম লোক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।' (বুখারি ও মুসলিম)

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ হলো একজন মানুষের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা অর্জন করলে তার জীবন হয় সুন্দর ও উন্নত। এর মাধ্যমে সে অর্জন করে সম্মান ও ভালোবাসা। সমাজের সকলে এ আদর্শ অনুশীলন করলে সমাজ হয় সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিময় এক আবাসস্থল।

অন্যদিকে সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ না থাকলে সমাজে শান্তি থাকে না। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রতারণা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া, ঐক্য, ভালোবাসা ইত্যাদি সদগুণাবলির চর্চা থাকে না। মানুষ পরস্পরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে। ফলে সমাজে নানা অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মহানবি (সা.)-এর হাদিস নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা পূর্বপাঠে হাদিসের পরিচয় লাভ করেছি। হাদিসের মাধ্যমে আমরা প্রিয়নবি (সা.) এর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি মানুষের সাথে কীরূপ আচরণ করতেন তা জানতে পারি। তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা জানতে পারি। তিনি আমাদের জন্য কী দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন তাও আমরা হাদিস পড়ে জানতে পারি।

হাদিস শরিফে প্রিয়নবি (সা.) আমাদের নানাবিধ নৈতিক ও মানবিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। স্নেহ, মমতা, দয়া, ক্ষমা, সাম্য, মৈত্রী, ভাতৃত্ব, ভালোবাসা, পরস্পর সহযোগিতা ইত্যাদি গুণ অনুশীলনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। আবার পরনিন্দা, মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, চুরি-ডাকাতি করা, গালিগালাজ করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ইত্যাদি খারাপ কাজ করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার, খোশামোদ-তোষামোদ ইত্যাদিও খারাপ অভ্যাস। এগুলো মানবিক আদর্শের বিপরীত। এগুলো নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। এগুলো থেকেও বিরত থাকার জন্য মহানবি (সা.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ

অর্থ: 'আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মিথ্যা পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে। আর পাপ কাজ জাহান্নামের পথে ধাবিত করে।' (মুসলিম)

সৎ গুণাবলির অনুশীলন ও অসৎ গুণাবলি থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমরা উত্তম চরিত্রবান হতে পারি। এগুলো আমাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায়ও সাহায্য করে। এভাবে হাদিসের শিক্ষা আমাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

হাদিস শরিফে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনচরিত ও উত্তম চরিত্রের আদর্শ বর্ণিত আছে। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলেছেন,

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

অর্থ: 'আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।' (সূরা আল-ক্বলম, আয়াত: ৪)

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি সবসময় নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অনুসরণ করতেন। তাঁর একটি উপাধি ছিল আল-আমিন। আল-আমিন অর্থ বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী। তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন। কথা ও কাজে সততা অবলম্বন করতেন। কেউ কোন কিছু আমানত বা গচ্ছিত রাখলে তিনি তা মালিকের নিকট যথাযথভাবে ফেরত দিতেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না, ওয়াদা ভঙ্গ করতেন না, বিশ্বাসঘাতকতা করতেন না। ফলে তাঁর শত্রুরাও তাকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী নামে ডাকত।

এভাবে দেখা যায়, সবধরনের সৎগুণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল, দয়াবান, অতিথিপরায়ণ, মিষ্টভাষী। তিনি অন্যায় ও অশ্লীল কাজ কখনো করতেন না। সারাজীবন তিনি মানুষকে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ আদর্শ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রিয়নবি (সা.)-এর চরিত্র অনুসরণ করলে আমরা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারব। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ মধ্যে রয়েছে উত্তম অনুপম আদর্শ।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)

রাসুল (সা.)-এর জীবনাদর্শ হাদিসের গ্রন্থাবলিতে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলো মানুষের জন্য দিকনির্দেশনা স্বরূপ। আমরা হাদিস পড়ে এগুলো জানব এবং সে অনুযায়ী আমল করব। তাহলে আমরা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারব।

ইসলামি অনুষ্ঠানের আয়োজন

আমরা এখন পর্যন্ত ইসলামের যে বিধিবিধান সম্পর্কে জানলাম, তার মধ্যে অন্যতম হলো ইবাদাত যা আগের অধ্যায়ে আমরা জেনেছি। আর এই ইবাদাতের সর্বোত্তম উপায় হলো সালাত আদায় করা। আগের অধ্যায় থেকে আমরা পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা সম্পর্কেও জেনেছি। এ অধ্যায়ে আরও জেনেছি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা, মুনাজাতের জন্য কিছু আয়াত এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। এবার তোমাদের একটি বিশেষ কাজ করতে হবে। তোমরা ইবাদাত সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা যা জেনেছ বা শিখেছ সেই সবকিছু মিলিয়ে একটি ইসলামি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সেই অনুষ্ঠানে তোমাদের বন্ধুদের কেউ কুরআন তিলাওয়াত করবে, কেউ হামদ-নাত উপস্থাপন করবে, কেউবা সালাতের ওযু, গোসল, তায়াম্মুমের যেসব নিয়ম শিখেছ সেগুলো দিয়ে বানানো কোনো পোস্টার প্রদর্শন করবে, আবার কেউবা কুরআন এবং হাদিসের বাণী উপস্থাপন করবে। কেউ আবার সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ফরয কাজগুলো কী সেগুলোও সবাইকে পোস্টার বানিয়ে দেখিয়ে বা মুখে বলে জানাতে পারো।

মানে হলো, তোমাদের একটি সুন্দর ইসলামি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে, যেখানে যেমন থাকবে তোমাদের নিজেদের আগে থেকে জানা ইসলামি কোনো উপস্থাপনা, একই সঙ্গে থাকবে ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বইটি থেকে এই পর্যন্ত যা যা তোমরা শিখেছ সেসবেরও উপস্থাপনা।

তাহলে দেরি না করে অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু করে দাও। আর এ বিষয়ে তোমাদের শিক্ষকের সহায়তা নাও। কবে কখন অনুষ্ঠানটি হবে, সেটি শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে নাও, আর বন্ধুরা সবাই নিজেদের কাজ ভাগ করে নিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করে দাও!

তাহলে এখন তোমাদের কাজ হলো–

কাজ-১২: (ইসলামি অনুষ্ঠানের আয়োজন)

- অনুষ্ঠানে কে কী উপস্থাপন করবে তা শিক্ষকের সহায়তায় ঠিক করা।
- অনুষ্ঠান উপস্থাপনের জন্য কুরআন তিলাওয়াত, হামদ-নাত ইত্যাদি অনুশীলন করা, কোনো পোস্টার দেখাতে চাইলে সেগুলো তৈরি করে ফেলা।
- অনুষ্ঠানটি কীভাবে চলবে (অনুষ্ঠানসূচি) তা ঠিক করা।
- ইসলামি অনুষ্ঠান উপস্থাপন এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষকের সহায়তায় সব বন্ধু মিলে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করবে। অনুষ্ঠানে তোমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করবে। তোমার বন্ধুদের কারও যদি কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে তাকে সেভাবে সহায়তা করবে। সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি পালন করতে পারলে, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক

প্রিয় শিক্ষার্থী!

আমরা তো সারাদিন অনেক কাজ করি, তাই না? একটু চিন্তা করে দেখো তো গতকাল তুমি কি কি কাজ করেছ? তোমার গতকাল করা কাজগুলোর মধ্যে কোনগুলোকে তুমি ভালো কাজ হিসেবে চিহ্নিত করবে বলোতো? চিন্তা করে দেখো, গতকাল তোমার করা কাজগুলোর মাঝে এমন বিশেষ কোনো কাজ আছে কিনা যেগুলোকে আমরা ভালো কাজ বলতে পারি। চিন্তা করে সেই কাজগুলো খাতায় লিখে ফেলো।

কাজ-১৩: তুমি গতকাল সারাদিন কি কি ভালো কাজ করেছ?

কাজ ১৩ হয়ে গেলে, তোমাদের শিক্ষক তোমাদের সবার করা ভালো কাজগুলো কি কি তা তোমাদেরকে জানাবেন। শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। বন্ধুরা গতকাল কি কি ভালো কাজ করেছে তা জানবে আর তুমি নিজেও সেইসব ভালো কাজগুলো করার চেষ্টা করবে।

আচ্ছা, আমরা কি সবসময়ই শুধু ভাল কাজ করি? কখনো কি এমন হয়ে যায় না যে, আমরা একটা কাজ করে ফেলেছি, যেটা হয়ত খুব ভালো কোনো কাজ হয়নি? আমরা হয়ত সবসময় জেনে বুঝে এমন কাজগুলো করি না, কিন্তু আমাদের দ্বারা এমন ছোট ছোট কিছু কাজ মাঝে মাঝে হয়ে যায়, তাই না?

চিন্তা করে দেখো, মাঝে মাঝে আমরা বাবা-মা এর প্রতি রাগ করে ফেলি, সময়মত পড়তে বসতে চাই না, ছোট ভাই-বোনদের বকা দিয়ে ফেলি, তাই না? এই কাজগুলো কিন্তু আসলে তেমন ভালো কোনো কাজ নয়। এখন আমরা এমন কিছু কাজ নিয়ে চিন্তা করব যেগুলো আমরা মাঝে মাঝে করে ফেললেও সেগুলো আসলে আমাদের করা উচিত নয়। তাহলে এখন তোমার কাজ হলো–

কাজ-১৪: গতকাল তুমি এমন কোনো কাজ করেছ যেটি ভালো কোনো কাজ হয়নি?

এই কাজটা যেকোনো ছোট বড় কাজ হতে পারে। চিন্তা করো এবং লিখে ফেলো। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই কাজটির কারণে শিক্ষক তোমাকে শাস্তি দিবেন না, বরং কীভাবে তুমি ভবিষ্যতে এমন কাজ থেকে দূরে থাকতে পারো তা শিক্ষক তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

আচ্ছা, সব বন্ধুরা কাজটি করে ফেললে শিক্ষক সেগুলো পড়ে দেখবেন এবং ভালো কাজ নয় এমন কয়েকটি কাজের উদাহরণ দিবেন। এরপর শিক্ষক তোমাদেরকে ইসলামি আখলাক বা চরিত্র সম্পর্কে জানাবেন।

আল-আখলাক

আখলাক (أَخْلَاقٌ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ স্বভাব, চরিত্র, আচার ও ব্যবহার ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আখলাক হচ্ছে মানব চরিত্র, ব্যক্তিগত স্বভাব, আচরণ এবং অন্য ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে তার আচরণগত অভিব্যক্তি।

আখলাক দুই ধরনের; যথা– (ক) আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্র; (খ) আখলাকে যামিমাহ বা মন্দ চরিত্র।

আখলাকে হামিদাহ (اَلْاَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ)

আখলাক অর্থ চরিত্র; আর হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয়। তাই আখলাকে হামিদাহ-এর অর্থ হলো প্রশংসনীয় চরিত্র। আখলাকে হামিদাহ-কে আবার আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্রও বলা হয়। মহান আল্লাহর পছন্দের ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসৃত উত্তম আচার-আচরণ বা স্বভাব-চরিত্র হলো আখলাকে হামিদাহ। মানুষের স্বভাব যখন সামগ্রিকভাবে সুন্দর, মার্জিত ও উত্তম হয়, তখন তাকে আখলাকে হামিদাহ বলে। সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, শালীনতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, আমানতদারি, ক্ষমা, পরোপকার, বিনয়-নম্রতা ও সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি আখলাকে হামিদাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। এসব গুণের চর্চার মাধ্যমে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। মহানবি (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর।' (বুখারি)

আখলাকে হামিদাহ অর্জনে আমাদের করণীয়: এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

- কথা, কাজ ও চিন্তায় সৎ হওয়া ও সততার নীতি অবলম্বন করা;
- অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা;
- আমানত রক্ষা করা;
- প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা;
- বিনয় ও নম্রভাবে চলাফেরা করা;
- ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলা;
- মিতব্যয়িতার পন্থা অবলম্বন করা;
- খারাপ সঙ্গ, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে পরিহার করে চলা;
- উচ্চঃস্বরে বা কর্কশ ভাষায় কথা না বলা;
- সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সততার ওপর অটল থাকা;
- কথা, কাজ ও চালচলনে শালীনতা বজায় রাখা ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা; এবং
- কোনো যথাযথ কারণ ছাড়া পরিবেশ-প্রকৃতি ও প্রাণীর ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকা।

আমরা এতক্ষণ আখলাকে হামিদাহ সম্পর্কে জানলাম। এবার এসো পাশের বন্ধুর সাথে মিলে নিচের কাজটি করে ফেলি।

জোড়ায় কাজ: **উত্তম চরিত্র গঠন আমরা আর কি কি করতে পারি?**

১।

২।

৩।

৪।

৫।

কতিপয় আখলাকে হামিদাহ

একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে অবশ্যই মানুষকে আখলাকে হামিদাহ বা সুন্দর গুণাবলি অর্জন করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা কতিপয় আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম ও প্রশংসনীয় চরিত্র সম্পর্কে জেনে নিই।

সত্যবাদিতা (اَلصِّدْقُ)

সত্যবাদিতা মানব জীবনের অন্যতম সেরা গুণ। সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। সত্যবাদিতা আমাদেরকে জান্নাতের পথ দেখায়। সত্যবাদী লোককে সবাই ভালোবাসে। সত্যবাদিতাকে আরবিতে বলা হয় আস-সিদক (اَلصِّدْقُ)। সাধারণত যে ব্যক্তি সিদক বা সত্যবাদিতা চর্চা করে তাকে সাদিক (صَادِقٌ) বা সত্যবাদী বলা হয়। আমাদের জীবনে সত্যবাদিতার ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার চর্চা করলে আমরা দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে মুক্তি পাবো। রাসুল (সা.) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ

অর্থ: 'তোমরা অবশ্যই সত্য কথা বলবে। কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়।' (মুসলিম)

সত্যবাদিতার উপকারিতা প্রসঙ্গে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, 'সত্য হলো প্রশান্তি এবং মিথ্যা হলো সংশয়।' (আত-তিরমিযি) আমাদের প্রিয়নবি (সা.) ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার চর্চা করে গেছেন। কোনো অবস্থায় তিনি মিথ্যা কথা বলেননি। বিশ্বসভ্যতায় তিনি সত্যের সুষ্ঠুধারা সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ○

অর্থ: 'সত্য সমাগত, মিথ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত; নিশ্চয়ই যা অসত্য-ভ্রান্ত, তার ধ্বংস অবধারিত।' (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৮১)

মহানবি (সা.) বলেছেন, 'সত্য বলো, যদিও তা তিক্ত হোক।' (বায়হাকি)

দলগত আলোচনা: সত্য কথা বলার সুফল

মাতাপিতার প্রতি সদাচার

মাতাপিতা আমাদের জীবনে আল্লাহর একটি বিশেষ নিয়ামত। দুনিয়াতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাঁদের অগণিত অনুগ্রহ নিয়েই বেড়ে উঠি। বিশেষত জন্ম থেকে শুরু করে আমাদের শৈশবের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের জীবন অচল। এ জন্য আনুগত্য, সদাচরণ ও ভালোবাসা পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসুলের পরেই মাতাপিতার স্থান। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ

অর্থ: 'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করবে না এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।' (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩)

মহান আল্লাহর এ বাণীর আলোকে মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা সন্তানের উপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে তাদের কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া হারাম। মাতাপিতা আমাদেরকে তাঁদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। আমাদের সুখ-শান্তির জন্য তাঁরা তাঁদের জীবনের সুখ-শান্তি বিলিয়ে দেন। আমরা যখন কোনো রোগ-শোকে আক্রান্ত হই, তখন তাঁদের দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। এমনকি তাঁরা তখন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে আমাদের আরোগ্য কামনায় ব্যাকুল থাকেন। আমাদের জীবনে তাঁদের অবদানের সঙ্গে অন্য কারও কোনো অবদানের তুলনাই হয় না। তাই মাতাপিতার নিকট আমরা চিরঋণী।

উপরে বর্ণিত আয়াত অনুসারে মাতাপিতা উভয়ের প্রতিই সদাচার করতে হবে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) মানুষের মধ্যে আমার নিকট সর্বোত্তম সেবা লাভের অধিকার কার? মুহাম্মাদ (সা.) বললেন, 'তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় জানতে চাইলেন, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় জানতে চাইলেন, তারপর

কার? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি আবারও জানতে চাইলেন, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার পিতার।' (বুখারি ও মুসলিম)। এ হাদিসে মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ গর্ভধারণের কষ্ট, সন্তান প্রসবের কষ্ট, জন্মের পর দুধ পান করানোর কষ্ট ছাড়াও আমাদের বেড়ে উঠার সময় মায়ের মায়া ও আত্মত্যাগ থাকে সীমাহীন। মহানবি (সা.) বলেন,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ۔

অর্থ: 'জান্নাত তো মায়েদের পদতলে।' (নাসাঈ)

পবিত্র হাদিসে পিতার মর্যাদা প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।' (তিরমিযি)

আল-কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনার আলোকে মাতাপিতার প্রতি সদাচরণে আমাদের করণীয় হলো–

- তাদের সঙ্গে নম্র ও কোমল ভাষায় কথা বলতে হবে;
- তাদের প্রতি বিনয়ের সঙ্গে দয়ার্দ্র ও দায়িত্বশীল হতে হবে;
- তাদের সেবা-যত্ন করতে হবে;
- তাঁরা ডাকলে সাড়া দিতে হবে এবং তাঁদের কাছে উপস্থিত হতে হবে;
- নিজের জন্য দোয়া করার সময় তাঁদের জন্যও এভাবে দোয়া করতে হবে; 'হে আমার রব! তাঁদের দুজনার প্রতি অনুগ্রহ করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন';
- তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে ইত্যাদি।

একক কাজ: তোমার মা-বাবার সঙ্গে তুমি প্রতিদিন কি কি ভালো কাজ করো এবং আরও কি কি করতে চাও তার তালিকা তৈরি করো।

আমি যা যা করি	আরও যা করতে চাই
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদাচার

আত্মীয় শব্দটি এসেছে আত্মা থেকে। আত্মীয় হলো আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ। আত্মীয়তা বলতে রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট আন্তরিক বন্ধনকে বোঝায়। আমাদের সবার উচিত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ও তাদের সঙ্গে সদাচার করা। আত্মীয়স্বজনরা আমাদের পরম আপনজন। আমাদের সুখ-দুঃখে তাঁরা দ্রুত এগিয়ে আসেন। তাঁরা প্রয়োজনে সুপরামর্শ ও নানা ত্যাগ স্বীকার করে বিপদ-আপদে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তাই মাতাপিতার হক আদায় করার পর আত্মীয়স্বজনের হক আদায় করা মুমিন হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى

অর্থ: 'মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং নিকটাত্মীয়দের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করবে।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)

আত্মীয়তার সম্পর্ককে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বড় অংশ আমাদের পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের। অর্থাৎ তাঁরা আমাদের মাতা ও পিতার খুবই নিকটজন ও আপনজন। যেমন– পিতৃকুলের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আমাদের দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফু-ফুপা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণ। আবার মাতৃকুলের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রয়েছেন- নানা-নানি, মামা-মামি, খালা-খালু ও তাদের সন্তান-সন্ততিগণ। আমাদের ভাই-বোন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণও আমাদের নিকটাত্মীয়। আবার বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় হলো স্ত্রী অথবা স্বামীর সকল রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন। উভয় দিক থেকে সকল প্রকারের আত্মীয়স্বজন আমাদের উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। তাদের সবার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামি আদব। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

অর্থ: 'তুমি তোমার আত্মীয়ের অধিকার আদায় করো।' (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৬)

আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদাচরণ ও সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব

ইসলাম আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদাচরণ ও সুসম্পর্ক রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আল্লাহর আদেশ পালনের অংশ। আল-কুরআনে একাধিক আয়াতে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদাচার ও সম্পর্ক বাজয় রাখা প্রসঙ্গে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

অর্থ: 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (বুখারি ও মুসলিম)

অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি রয়েছে মহান আল্লাহর রহমত সেখানে অবতীর্ণ হয় না।' (বায়হাকি)

আমাদের প্রিয়নবি (সা.) কেবল আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচরণ ও সুসম্পর্ক রাখার ব্যাপারে আদেশই প্রদান করেননি বরং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এ ব্যাপারে চমৎকার আদর্শ স্থাপন করেছেন।

দলগত কাজ: আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আমরা কি কি করতে পারি? একটি তালিকা তৈরি করো।

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার

প্রতিবেশীরা হচ্ছেন আমাদের নিকটজন। সাধারণত যাঁরা আমাদের অতি নিকটে বা পাশাপাশি বসবাস করেন, তাঁরাই আমাদের প্রতিবেশী। কত দূর এলাকার অধিবাসীরা প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হবে, এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন– 'সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সবাই প্রতিবেশী।'

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ জীবনে সুখ-শান্তির জন্য আমরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এ জীবনে আমরা প্রতিবেশী ছাড়া চলতে পারি না। তাঁরা আমাদের ভালো-মন্দ খবরাখবর সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশি জানেন। অনেক সময় আমাদের বিপদে আত্মীয়রা ছুটে আসার আগেই প্রতিবেশীরা আমাদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তাই তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা ও সদাচারণ করা এবং তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। প্রতিবেশী যে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা যে পর্যায়েরই হোক না কেন, সবার প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করা আমাদের নৈতিক ও ইমানি দায়িত্ব।

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রতি এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জিবরাইল আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হলো, হয়তো আল্লাহ তা'আলা প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।' (বুখারি)

প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেশীর দুঃখে ব্যথিত হওয়া এবং সুখে আনন্দিত হওয়া, প্রতিবেশী কোনো বিপদে পড়লে তার বিপদ মুক্তির জন্য চেষ্টা করা, প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাবার দেওয়া ইত্যাদি কাজ প্রকৃত মুমিনের পরিচায়ক। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

অর্থ: 'ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে পেট পুরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।' (বুখারি)
প্রতিবেশীর সঙ্গে অসদাচরণ করা এবং তাদের কষ্ট দেওয়া ও তাঁদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা অনুচিত। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, 'যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ বোধ করে না, সে ব্যক্তি ইমানদার নয়।' (বুখারি)

মাথা খাটিয়ে লিখি: যে সকল কাজ করে আমরা উত্তম প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হতে পারি–

১।

২।

৩।

৪।

৫।

বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করা মানব চরিত্রের অন্যতম প্রশংসনীয় দিক। ছোটরা যেমন দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ দায়িত্বশীল নাগরিক, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠরা সমাজের স্তম্ভ। তাই ছোটদের যেমন স্নেহ, আদর-ভালোবাসা দিতে হবে, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এটি মহানবি (সা.) -এর শিক্ষা। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমরা বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী তা জানব।

ইসলাম বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান প্রদর্শন ও ছোটদের স্নেহ করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.) বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করতেন এবং ছোটদের স্নেহ ও আদর করতেন। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। মহানবি (সা.) বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

অর্থ: 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করে না সে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।' (তিরমিযি)

বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, শালীনতা বজায় রেখে কথা বলা, কোন কাজ শুরুর আগে তাদের পরামর্শ নেওয়া, তাদের উপদেশ মেনে চলা, প্রয়োজনে তাদের কাজকর্মে সহযোগিতা করা ছোটদের নৈতিক দায়িত্ব। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'কোনো বৃদ্ধকে যদি কোনো যুবক বার্ধক্যের কারণে শ্রদ্ধা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ যুবকের জন্য বৃদ্ধ অবস্থায় এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে শ্রদ্ধা করবে।' (তিরমিযি)

ছোটরা বসা থাকলে উঠে বয়োজ্যেষ্ঠদের বসার ব্যবস্থা করবে। আমরা রাসুলের জীবনচরিত থেকে দেখতে পাই যে, তাঁর নিকট যখন কাফের সর্দাররা আসত, তিনি তাদের যথোপযুক্ত সম্মান করতেন। তাদেরকে বসার জায়গা করে দিতেন, সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। আবু জাহ্‌ল ছিলেন ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন। মহানবি (সা.)-কে ইসলাম প্রচারের কাজে সে বিভিন্নভাবে বাধা প্রদান করেছে। এমনকি রাসুলুল্লাহ (সা.) নামায আদায়ের জন্য যে রাস্তায় যাতায়াত করতেন, সেই রাস্তায় আবু জাহ্‌ল লোকজন দিয়ে বড় একটি গর্ত করে রাখে, যাতে মহানবি (সা.) রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গর্তের মধ্যে পড়ে যান। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায়, সেই গর্তে আবু জাহ্‌ল নিজেই পড়ে যায়। আর প্রিয়নবি (সা.) আবু জাহ্‌লকে ওই গর্ত থেকে উঠতে সাহায্য করেন। শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণেই মহানবি (সা.) তাকে এই সম্মান দেখিয়েছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে কোনো পরিস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠকে অবশ্যই সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

ছোটদের স্নেহ করা মহানবি (সা.)-এর আদর্শ। তিনি ছোটদের খুব আদর করতেন। তাদের সঙ্গে কোমলভাবে মিশতেন, কখনো বা কৌতুক করতেন। শুধু নিজের ছেলেমেয়েই নয়, সব শিশুকেই তিনি সমানভাবে ভালোবাসতেন। ছোটদের প্রতি তাঁর আচরণ কিরূপ ছিল, তা নিচের ঘটনা থেকে বোঝা যাবে।

একবার আবিসিনিয়া থেকে একদল সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে মদিনায় আগমন করলেন। তাঁদের সাথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ছিল। মহানবি (সা.) ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে একেবারে মিশে গেলেন। তাদের সাথে খেলাধুলা করলেন, এমনকি তাদের ভাষায় কথা বলে তাদেরকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এভাবে তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের মন জয় করলেন।

অন্য একদিনের ঘটনা। মহানবি (সা.) নামায পড়ছিলেন। সিজদারত অবস্থায় শিশু হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.) নানার পিঠের ওপর আরোহন করলেন। তাঁরা পিঠ থেকে না নামা পর্যন্ত মহানবি (সা.) সিজদাহ থেকে উঠলেন না। ফলে সিজদাহ দীর্ঘায়িত হলো। নামায শেষে মুসল্লিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আজ সিজদাহ বেশ দীর্ঘায়িত করলেন? তিনি জবাবে বললেন, আমার নাতিরা আমাকে সওয়ারি বানিয়েছে। তাই তাঁদের তাড়াতাড়ি পিঠ থেকে নামিয়ে দেওয়াটা আমার পছন্দ হয়নি। (মুসনাদ আহমদ, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

একবার মহানবি (সা.) তাঁর দৌহিত্র শিশু হাসান ও হুসাইনকে চুমু দেন এবং পালক পুত্রের শিশু সন্তান উসামাহকেও চুমু দেন। এ দেখে এক গ্রাম্য লোক বলেছিল, আমার তো বারোটি সন্তান, অথচ কাউকে কখনো চুমু দিয়ে আদর করিনি। তখন মহানবি (সা.) বললেন- 'তোমার দিল থেকে আল্লাহ যদি রহমত উঠিয়ে নেন, তো আমার কি করার আছে।'

মহানবি (সা.) সবসময় শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতেন। অন্যদের তুলনায় তাদেরকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। ছোটদের আবদার রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। ইয়াতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সন্তান-সন্ততিকে স্নেহ করো এবং তাদের উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দাও' (ইবনে মাজাহ)। এছাড়াও তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে এমন আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ সৃষ্টি হয়।

ছোটদের ভালো কাজের মূল্যায়ন করা ও উৎসাহ প্রদান করা বয়োজ্যেষ্ঠদের কর্তব্য। এতে ছোটদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। ভালো কাজের প্রতি আরও বেশি উৎসাহিত হয়।

ছোটদের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠদের করণীয় হলো-

- ছোটদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা;
- তাদের সাথে কোমল আচরণ করা;
- তাদের সাথে খেলাধুলা ও কৌতুকে মেতে ওঠা;
- তাদের প্রতি কখনো বিরক্ত না হওয়া বা অতিরিক্ত রাগ প্রকাশ না করা;
- তাদেরকে উত্তম মানবীয় গুণাবলি শিক্ষা দেওয়া;
- তাদের কাজ ও মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া;

একক কাজ: তোমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে তুমি প্রতিদিন কি কি উত্তম আচরণ করে থাকো এবং আরও কি কি করতে চাও তার তালিকা তৈরি করো।

আমি যা যা করি	আরও যা করতে চাই
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার

ইসলাম সকল ধর্মের মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণের শিক্ষা দেয়। ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা ইসলামি শিষ্টাচার। আল্লাহ সকল মানুষকে সম্মানিত করেছেন। তাই মানুষ হিসেবে সবাই সমান। হাদিসে এসেছে, একদিন সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) ও কায়েস ইবনে সা'দ (রা.) কাদেসিয়া এলাকায় বসা ছিলেন। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা

দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হলো, লাশটি অমুসলিমের। তাঁরা বললেন, মহানবি (সা.) এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইয়াহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, তিনি কি একটি প্রাণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না? (বুখারি)

সুখে-দুঃখে ভিন্ন ধর্মের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের যে কোনো বিপদে-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করা ইসলামের শিক্ষা। মহানবি (সা.) যে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করত। বিপদে-আপদে ও দুঃখে-কষ্টে মহানবি (সা.) সবার পাশে দাঁড়াতেন। এমনকি তিনি অমুসলিম রোগীকে দেখতে তাদের বাসায় যেতেন ও তাঁদের সেবা করতেন। সর্বদা তাদের অধিকারের সুরক্ষা দিতেন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জেনে রেখো! কোনো মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিকের ওপর যুলুম নির্যাতন করে, অথবা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে অথবা তার কোনো জিনিস বা সহায়-সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেয়; তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় আমি তার বিপক্ষে, অমুসলিমদের পক্ষে বাদী হবো। (আবু দাউদ)। হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলে আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে জানতে চাইলাম– আমি কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি তাঁর সঙ্গে মায়ের মতোই আচরণ করবে।' (বুখারি)

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এজন্য ইসলাম উদারভাবে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধনের নির্দেশ দিয়েছে। তাই ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের প্রতিও মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের প্রতি মুসলিমরা যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে তা হলো–

- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম পালন ও উৎসবে বাধা প্রদান করবে না;
- তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলবে ও সুন্দর আচরণ করবে;
- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের উপর জোর প্রয়োগ করা যাবে না;
- সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও সেবার আদান-প্রদান করতে বাধা নেই;
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জানমালের নিরাপত্তা দিতে হবে;
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোনো আত্মীয়স্বজন থাকলে তার সঙ্গে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে; এবং
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে, তাদের দুঃখে-কষ্টে পাশে দাঁড়াতে হবে।

বাড়ির কাজ: ভিন্ন ধর্মের অনুসারী বন্ধু বা প্রতিবেশীর সঙ্গে তোমার ভালো সম্পর্কের বিষয়ে একটি গল্প লেখো।

সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সদাচার

ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-গরিব সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলের সাথে মানবীয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। মানুষ হিসেবে সকলকে সম্মান প্রদর্শন করে সমাজে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নিশ্চিত করেছে। মহানবি (সা.) সকল সৃষ্টি জীবের কল্যাণের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি তো আপনাকে জগৎসমূহের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)। তাই সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ মিলেমিশে একত্রে সমাজে বসবাস করা ও সমস্ত সৃষ্টিজীবের কল্যাণ সাধন করা মানুষের দায়িত্ব।

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা বাবা আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) থেকেই সকল মানব সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন মাজিদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى

অর্থ: 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

অতএব সমগ্র মানবজাতি একটি পরিবার। মহানবি (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ

অর্থ: 'সমস্ত সৃষ্টি জগত আল্লাহর পরিবার স্বরূপ। সুতরাং সৃষ্টিজগতের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে।' (বায়হাকী)

সুতরাং সকল মানুষ ও মহান আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিজীব এ বৃহৎ পরিবারের সদস্য। পরিবারের সবাই মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজে বসবাস করবে– এটাই ইসলামের শিক্ষা। তাই আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব প্রভৃতি ভেদাভেদ ভুলে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করব, অপরের বিপদে এগিয়ে আসব, সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করব। মহানবি (সা.) মদিনা সনদে উল্লেখ করেন, প্রতিবেশীকে নিজের মতই গণ্য করতে হবে। তার কোনো ক্ষতি বা তার প্রতি কোনো অপরাধ সংঘটন করা যাবে না। মদিনার কেউ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা প্রতিহত করা হবে। মজলুমকে সবাই সাহায্য করবে। এর ফলে মদিনায় বসবাসরত সকল ধর্ম, গোত্র ও সম্প্রদায়ের নাগরিকরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে ও সকল বিপদে আপদে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। তাঁর শাসনামলে ভিন্নধর্মাবলম্বী কোনো ব্যক্তি অসুস্থ বা বৃদ্ধ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তিনি তার বার্ষিক 'কর' মওকুফ করে দিতেন এবং বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দিতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ও অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি একবার এক গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এক অসহায় বৃদ্ধ তাঁর পেছন থেকে ধরে বসল। ওমর (রা.) বিনয়ের সঙ্গে

জিজ্ঞেস করলেন, কী দরকার? বৃদ্ধ বললেন, কর মওকুফ, কিছু সাহায্য ও বার্ধক্য ভাতা। ওমর (রা.) তাকে সর্বপ্রথম নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ও সাহায্য প্রদান করলেন। এরপর বায়তুল মালের হিসাবরক্ষকের কাছে তাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ বৃদ্ধ এবং তার মতো আরও যত বৃদ্ধ আমাদের দেশে আছে, সবার কর মওকুফ করে দাও এবং খাদ্যভাণ্ডার থেকে তাদের সাহায্য করো। এমন ব্যবহার কিছুতেই সমীচীন নয় যে, আমরা তাদের যৌবনে শুল্ক গ্রহণ করে বার্ধক্যে তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবো। বৃদ্ধ লোকটি ছিল ইয়াহুদি ধর্মের অনুসারী। (ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ)

উপরোক্ত ঘটনার আলোকে আমাদের চারপাশে যে সকল অমুসলিম রয়েছে তাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তুলতে হবে। একইসাথে সকল অমুসলিমদের সাথে উত্তম আচরণ ও সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। এ সবই আল্লাহর দান। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'আর পৃথিবী, তাকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি; এবং আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্‌গত করেছি সুপরিমিতভাবে, আর তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও। আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দিই; আর তোমরা তার ভাণ্ডার রক্ষক নও।' (সূরা আল-হিজর, আয়াত: ১৯-২২)

পরিবেশের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করা হলে এর ভারসাম্য নষ্ট হয়। ইসলাম মানুষের সুস্থতাকে উন্নত পরিবেশের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চায়। সেজন্য ইসলাম পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর। নোংরা ও দূষিত পরিবেশ রোগব্যাধির প্রধান কারণ। তাই যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা, কফ, থুথু ও মলত্যাগ করা যাবে না। প্রকৃতিকে তার নিয়মানুযায়ী চলতে দেওয়া দরকার। তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা ও দূষণ প্রতিরোধে সবার দায়িত্ব পালন করা দরকার। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ হয় অন্যদিকে এটি রুচিহীন কাজ। তাই মানুষের সুস্থ থাকার জন্য পরিবেশকে যথাযথ ও দূষণমুক্ত রাখার প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রিয়নবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের আঙ্গিনাকে পরিচ্ছন্ন রাখো।' পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ।' (মুসলিম) অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, 'তোমরা তিনটি অভিসম্পাতপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকো; যাওয়া-আসার স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা, রাস্তার মধ্যস্থলে মলমূত্র ত্যাগ করা এবং গাছের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা।' (আবু দাউদ)

সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য চাই সুস্থ, সুন্দর ও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। পরিবেশের ভারসাম্য ও সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন জরুরি। পরিবেশের ভারসাম্য ও তাপমাত্রা কমানোর জন্য বনাঞ্চল ও গাছপালা অতীব প্রয়োজনীয়। পরিবেশের ক্ষতি করে এমন যেকোনো কাজ করতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়, বিনাশ অথবা অপরিমিত ব্যবহার কোনোটিই ইসলামের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়। পরিবেশ

ধ্বংসের যেকোনো ধরনের কাজ আল্লাহ প্রদত্ত সেবা থেকে বঞ্চিত করার শামিল। মহানবি (সা.) পরিবেশ রক্ষায় গাছ কাটতে নিষেধ করেছেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যদি তুমি বুঝতেও পারো যে, কিয়ামত (মহাধ্বংস) আসছে এবং তোমার হাতে একটি গাছের চারা থাকে, তবুও তুমি চারাটা লাগিয়ে দাও।' (মুসনাদ আহমদ) অন্য হাদিসে প্রিয়নবি (সা.) বলেন, 'গাছ লাগানো মুসলিমদের জন্য সাদকাস্বরূপ।' (বুখারি) মহানবি (সা.) আরও বলেছেন, 'যদি কেউ গাছ লাগিয়ে মারাও যায় কিন্তু গাছ যদি বেঁচে থাকে এবং তার ফল ও ছায়া মানুষ ও পশু-পাখি যতদিন ভোগ করবে, ততদিন মৃত ব্যক্তি নেকি পেতে থাকবে।' (মুসনাদ আহমদ) অন্যত্র এক হাদিসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি গাছ লাগায় এবং গাছের যত্ন করে তাকে বড় করে, সেই গাছের একটি ফলের হিসাবে তার আমলনামায় একটি করে নেকি লেখা হয়।' (মুসনাদ আহমদ)

নদীর পানি দূষিত করা, পাহাড় কাটা, বদ্ধ পানিতে বর্জ্য-ময়লা ফেলা, শিল্প-কারখানার ধোঁয়া, কার্বন নিঃসরণ ইত্যাদি পরিবেশ বিপর্যয়কারী বিষয় থেকে বিশ্বের সকল মানুষের বিরত থাকতে হবে। আমাদের প্রিয় স্বদেশকে পরিবেশবান্ধব রাখব। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিজীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় কিছু বিষয়–

- প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতি করে এমন যেকোনো কাজ থেকে বিরত থাকা;
- ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা;
- গাছ কাটার প্রবণতা কমিয়ে বেশি বেশি গাছ লাগানো;
- কলকারখানার বর্জ্য ও রাসয়নিক পদার্থ পরিবেশে ফেলার আগে পরিশোধন করা;
- উচ্চ শব্দ নিয়ন্ত্রণ;
- পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ;
- পানিতে কীটনাশক, ক্ষতিকারক বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে; এবং
- পরিকল্পিত নগরায়ণ।

সম্মিলিত কাজ: ষষ্ঠ শ্রেণির সকল বন্ধু মিলে তোমাদের শ্রেণিকক্ষ এবং এর আশপাশের এলাকা পরিষ্কার করো।

আখলাকে যামিমাহ (اَلْاَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ)

আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় চরিত্র। আখলাকে যামিমাহ বলতে মানুষের মন্দ আচরণ যেমন– মিথ্যা বলা, প্রতারণা, ধোঁকা, ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, গিবত, গালি ও মন্দ কথা, অশ্লীলতা, অপচয়, অহংকার, ক্ষতিকর আসক্তি ইত্যাদিকে বোঝায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দুষ্ট ও কঠোর স্বভাবের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (আবু দাউদ)

আখলাকে যামিমাহ আত্মিক ও মানসিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন করে। যার মধ্যে মন্দ আচরণ বিদ্যমান সে সকলের কাছে ঘৃণিত। এরা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকে। একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে গেলে অবশ্যই মানুষকে আখলাকে যামিমাহ বর্জন করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা কতিপয় আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র সম্পর্কে জেনে নেই।

মিথ্যা

যা সত্য নয় তা-ই মিথ্যা। কথা ও কাজে জেনেশুনে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা একটি মন্দ আচরণ। মিথ্যাকে সকল পাপ কাজের জননী বলা হয়। একটি মিথ্যা থেকে অসংখ্য মিথ্যার জন্ম হয়। তাই কোনোভাবেই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। বিক্রি করার সময় মিথ্যা বলা, ওজনে কম দেওয়া কিংবা ভেজাল দেওয়াসহ নানা রকম প্রতারণা করা উচিত নয়। এমনকি হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমেও মিথ্যা বলা যাবে না।

মিথ্যার পরিণাম

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ। এটি একটি কবিরা গুনাহ বা মহাপাপ। মিথ্যা সকল পাপের মূল। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও অন্যের সম্পদ আত্মসাতসহ সকল অনৈতিক ও সমাজবিরোধী কর্মের মূলে রয়েছে মিথ্যাচার। যে সমাজে মিথ্যাচার বৃদ্ধি পায়, সে সমাজ ক্রমে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

মিথ্যাচার একটি নিন্দনীয় আচরণ। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না এবং ভালোবাসে না। বিপদের সময় তাকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। তার কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। মহান আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুব অসন্তুষ্ট হন। মহান আল্লাহ বলেন: 'আর তোমরা দূরে থাক মিথ্যা কথন থেকে।' (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩০)

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে নানাবিধ মন্দ কাজ নিষেধ করা হয়েছে।

মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কেননা, মিথ্যা পাপাচার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ব্যক্তি যখন অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে তখন আল্লাহর নিকট তাকে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকের নিদর্শনও বটে। হাদিসে বলা হয়েছে,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

অর্থ: 'মুনাফিকের আলামত তিনটি— যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, আমানতের খেয়ানত করে এবং ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

অতএব, মিথ্যা সর্বদা পরিত্যাজ্য। আমারা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব কারও সাথেই মিথ্যা বলব না।

প্রতারণা

প্রতারণা হচ্ছে অসদুপায় অবলম্বন করে কোনো কিছু পাওয়ার চেষ্টা করা। প্রচলিত আইন বা নিয়ম-কানুনকে উপেক্ষা করে কিংবা ফাঁকি দিয়ে অসৎ উপায়ে কোনো কিছু অর্জন করাকে প্রতারণা বলে। আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকমের প্রতারণামূলক কাজ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন– বিশ্বাস ভঙ্গ করা, মিথ্যা শপথ করা, ওজনে কম দেওয়া, পণ্য বিক্রিতে দোষ গোপন করা, পণ্যে ভেজাল দেওয়া, দেশে-বিদেশে চাকরি দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া, অন্যের হক নষ্ট করা, অফিস-আদালত ও লেনদেনে দুর্নীতি করা এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা ইত্যাদি।

বর্তমান সমাজের সবস্তরে প্রতারণা ছড়িয়ে পড়েছে। একশ্রেণির মানুষ প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করছে। আবার কিছু মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে প্রতারণা করছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নামেও অনেক মানুষ প্রতারণা করছে। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে প্রতারণা ও জালিয়াতি অধিক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রতারণার কুফল

প্রতারণা একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ। প্রতারণার জন্য মানুষকে বিভিন্ন রকমের দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করতে হয়। প্রতারণা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সত্যিকার ইমানদার কখনোই প্রতারণার আশ্রয় নেয় না, মানুষকে ধোঁকা দেয় না এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

প্রতারণার কুফল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ
وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۭ

অর্থ: 'দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকদের থেকে মেপে নেবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। কিন্তু যখন তারা অন্যকে মেপে ও ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।' (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত: ৩)

আমাদের সমাজে নানারকম প্রতারণা দেখতে পাওয়া যায়। যে রূপেই প্রতারণা করা হোক না কেন, ইসলাম সেটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাসূল (সা.) প্রতারণামূলক সকল ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়ছেন। মহানবি (সা.) একবার বাজারে খেজুরের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তার অভ্যন্তরে ভেজা খেজুর পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটি কী? জবাবে সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, বৃষ্টির কারণে ভিজে গেছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি খেজুরগুলো উপরে রাখলে না কেন? তাহলে তো ক্রেতাগণ এর অবস্থা দেখতে পেত (প্রতারিত হতো না)। এরপর রাসুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (মুসলিম)

অন্য এক হাদিসে আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, অর্থাৎ, 'প্রতারণার ঠিকানা জাহান্নাম।' (সহিহ ইবনু হিব্বান)

পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, জীবনের কোনো কাজেই প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া

যাবে না। একবার যদি কেউ প্রতারণা করে তবে তাকে কেউ আর বিশ্বাস করে না। একবার বিশ্বাস ভঙ্গ হলে আর কোনোভাবেই সে বিশ্বাস তৈরি করা যায় না। প্রতারণা করে আপাতদৃষ্টিতে কিছু অর্জন করতে পারলেও তার সার্বিক ফল ভালো হয় না। একজন মুসলমান কখনই অন্য কাউকে ধোঁকা দিতে পারে না। তাই একটি কল্যাণকর সমাজ গড়ে তুলতে আমাদের সকলকে ব্যক্তিগত, পারিরবারিক ও সামাজিক জীবনসহ সকল ক্ষেত্রে ধোঁকা ও প্রতারণা পরিহার করে সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করতে হবে।

ইসলাম থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, জীবনের কোনো কাজেই প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। প্রতারণা একটি অপরাধ। একবার যদি কেউ প্রতারণা করে তবে তাকে কেউ আর বিশ্বাস করে না। একবার বিশ্বাস ভঙ্গ হলে আর কোনোভাবেই সে বিশ্বাস তৈরি করা যায় না। প্রতারণা করে আপাতদৃষ্টিতে কিছু অর্জন করতে পারলেও তার সার্বিক ফল ভালো হয় না। একজন মুসলমান কখনই অন্য কাউকে ধোঁকা দিতে পারে না। ধোঁকা ও প্রতারণামুক্ত সমাজ গড়তে আমাদের সকলকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

গিবত বা পরনিন্দা

গিবত একটি সামাজিক অনাচার। কারও অগোচরে তার দোষত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশ করাকে গিবত বলে। একে পরনিন্দাও বলা হয়। গিবত একটি ঘৃণিত ও জঘন্য কাজ। এটি কবিরা গুনাহ। এ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'গিবত কী তা কি তোমরা জানো?' লোকেরা উত্তরে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন । রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'গিবত হলো তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তার অগোচরে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, এটাও কি গিবত হবে?'

রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই গিবত হবে। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তা হবে অপবাদ।' (মুসলিম) গিবত একটি নিন্দনীয় কাজ। গিবতের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে সমাজ জীবনে ঝগড়া-ফাসাদসহ নানা অশান্তি সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমে গিবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ
اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۭ

অর্থ: 'তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে, নিশ্চয়ই তা তোমরা অপছন্দ করবে।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২)

গিবত করার মতো গিবত শোনাও পাপের কাজ। কেউ গিবত করলে তাকে গিবত থেকে বিরত রাখা কর্তব্য। তাহলে গিবতচর্চা সমাজ থেকে দূরীভূত হবে।

সর্বাবস্থায়ই গিবত বা পরনিন্দা থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ, কোনো অবস্থায়ই গিবত জায়েজ বা বৈধ নয়। কেউ যদি গিবত করে তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যার গিবত করা হয়েছে তার থেকে অবশ্যই মাফ করিয়ে নিতে হবে। আর সে যদি মারা যায়, তার থেকে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহর নিকট তার গুনাহ মাফের দোয়া করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নিঃসন্দেহে গিবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গিবত বা কুৎসা রটনা করেছ তার জন্য এভাবে দোয়া করবে: হে আল্লাহ তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।'

গিবত বা পরনিন্দা ইমান ও আমল ধ্বংস করে দেয়। মানুষের মধ্যে একতা নষ্ট হয়, অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি নষ্ট হয়। ফলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যে গিবত করে তার ভালো আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তাইতো সর্বদা গিবত বা পরনিন্দা থেকে দূরে থাকতে হবে। সমাজ থেকে গিবত দূর করতে আমাদের সকলকে একত্র হয়ে কাজ করতে হবে। তা না হলে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সমাজে গিবত বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজের জন্য অমঙ্গলের কারণ হবে।

গালি ও মন্দ কথা

কাউকে মন্দ নামে ডাকা, মন্দ কথা বলা, তিরস্কার করা, অশালীন বা অশ্লীল কথা বলা হলো গালি দেওয়া। এটি একটি নিন্দনীয় কাজ। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ

অর্থ: 'ইমান আনয়নের পর মন্দ নামে ডাকা অতিশয় গর্হিত কাজ।' (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত: ১১)

মানুষ সভ্য জাতি, তারা কাউকে গালি দেবে না। সমাজে একত্রে বসবাস করতে হলে পরস্পরের সঙ্গে মতের অমিল থাকতে পারে। একে অপরের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিও হতে পারে। একের সঙ্গে অন্যের কথা কাটাকাটি হতে পারে। তা সত্ত্বেও একে অন্যকে অশালীন বা অশ্লীল কথা বলে গালি দেওয়া উচিত নয়। অশালীন কথা বলা নিতান্তই খারাপ কাজ। যে গালি দেয় ও অশালীন কথা বলে, সে সমাজে ঘৃণিত। তাকে মানুষ পছন্দ করে না। সমাজে তার কোনো সমাদর থাকে না। তার সঙ্গে কেউ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে না। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) গালি দিতে বা গালাগাল করতে নিষেধ করেছেন।

একবার মহানবি (সা.) কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের এমন এক ব্যক্তি গালি দেয়, যে আমার থেকে নিচু। এর প্রতিশোধ নিতে আমার কোনো বাধা আছে কি? রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, 'পরস্পর গালমন্দকারী উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং একে অপরকে দোষারোপ করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

গালি সম্পর্কে আরও বলেছেন, মাতাপিতাকে গালি দেওয়া মহাপাপ। সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এমন কোনো নরাধম আছে যে আপন মাতাপিতাকে গালি দেয়?' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি অপরের মাতাপিতাকে গালি দেয় এবং এজন্য সে-ও তার মাতাপিতাকে গালি দেয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

এ হাদিস শরিফ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্যের মাতাপিতাকে গালি দেওয়া মানে নিজের মাতাপিতাকে গালি শোনানো। সমাজকে গালিমুক্ত করতে গালির উত্তরে গালি দেবো না, এতে গালমন্দকারী লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। গালমন্দ ভালো কাজ নয়, গালমন্দের মতো অশালীন কাজ হতে আমরা বিরত থাকব।

গল্প বলার আসর

প্রিয় শিক্ষার্থী,

অনেক তো ভালো কাজ আর মন্দ কাজ সম্পর্কে জানা হলো। এবার তাহলে একটা আনন্দের কাজ করা যাক। এসো এবারে বন্ধুরা মিলে একটি গল্প বলার আসরের আয়োজন করি।

ক্লাসের বন্ধুরা মিলে এবার একটি গল্প বলার আসরের আয়োজন করবে। সেখানে তোমরা এতদিন যেসকল আখলাকে হামিদাহ আর আখলাকে যামিমাহ এর ব্যাপারে জেনেছ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। তুমি বা তোমার পরিচিত কেউ কিভাবে প্রতিদিন আখলাকে হামিদাহ এর চর্চা করেছে তার গল্প বলবে। আখলাকে যামিমাহগুলো থেকে দূরে থাকতে তুমি কি কি কাজ করছ, অন্যকে কিভাবে সহায়তা করছ সেই গল্প বলবে। আর বন্ধুদের গল্পগুলোও শুনবে। এটাই কাজ।

তোমাদের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক শ্রেণির কাজের সময় থেকে একটা দিন ঠিক করে নিয়ে সেদিন তোমরা এই গল্প বলার কাজগুলো করবে। নিজেরা গল্প বলবে, অন্যের গল্প শুনবে। শিক্ষকও তোমাদের সাথে গল্প বলার কাজে অংশগ্রহণ করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনাদর্শ

প্রিয় শিক্ষার্থী

আমরা ইমান, আকিদা, সালাত এবং আখলাক সম্পর্কে জানলাম। উত্তম চরিত্র গঠনে এ সবই ইসলামের শিক্ষা। এ সবই আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে চাই। এখন একটু চিন্তা করে দেখোতো এমন কি কি কাজ আছে যা করলে আমরা একটি আদর্শ জীবন লাভ করতে পারব? কোন কোন আচরণ বা কাজ করলে আমরা বলতে পারব যে, আমরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী, ভালো মানুষ। চিন্তা করো এবং শ্রেণির কাজের খাতায় লেখো। তারপর বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে দেখো তোমার বন্ধুরা এ ব্যাপারে কি চিন্তা করছে।

এবার এসো জেনে নিই, আল্লাহ তা'আলা আমাদের আদর্শ জীবন গঠনের জন্য কি শিক্ষা দিয়েছেন।

আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি ওহি নাযিল করে আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর নিকট থেকে ওহিপ্রাপ্ত এ বান্দাগণই হলেন নবি ও রাসুল। আর যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর আদর্শ অনুসরণ করে নিজের জীবনকে আলোকিত ও মহিমান্বিত করেছেন তাঁরা হলেন আল্লাহর প্রিয় বন্ধু বা ওলি। আমরা মহান আল্লাহর ঐ সকল মহান নবি-রাসুল ও ওলিদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানব। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের জীবন আলোকিত করব।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তাঁকে আমাদের জন্য পৃথিবীতে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ○

অর্থ: 'আমি তো আপনাকে জগৎসমূহের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

আরবের সমকালীন পরিবেশ

মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাব সময়কালকে আইয়্যামে জাহেলিয়া বলা হতো। আইয়্যামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগ। এ সময় আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা খুবই ভয়াবহ ছিল। সমগ্র আরববাসী শিরক ও পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল। তারা মদ, জুয়া, নারী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে নিমগ্ন থাকত। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দের কোনো পার্থক্য ছিল না। ঝগড়া-বিবাদ, চুরি-ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, দুর্নীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ-ই ছিল তাদের জীবন। তারা এক আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করত। পবিত্র কাবা গৃহে তখন ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল।

এ সময় আরবের নারীদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তাদের কোনো সামাজিক অধিকার বা মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে ভোগের সামগ্রী মনে করা হতো। তারা কন্যা সন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্য ও লজ্জার কারণ মনে করত। এমনকি কোনো কোনো গোত্র তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধা করত না। পণ্যদ্রব্যের ন্যায় দাস-দাসি বাজারে বিক্রয় করা হতো এবং তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হতো। এরকম ভয়াবহ নৈতিক অধঃপতনের পরেও তারা সাহসিকতা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, কাব্যচর্চা, বাগ্মিতা, গোত্রপ্রীতি ও আতিথেয়তা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করত। তারা কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা থেকে দূরে থাকত, তাদেরকে 'হানিফ' বলা হতো।

এরকম ঘৃণ্য পাপাচার, কুসংস্কার ও বর্বরতায় নিমজ্জিত আরববাসীদের মধ্যে প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণ করা হয় বিশ্ববাসীর রহমতস্বরূপ। তিনি সকল নবি-রাসুলগণের মধ্যে সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তিনি নবিগণের নবি, আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম ও পরিচয়

আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদেকের সময় মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে হস্তিবাহিনীর ঘটনার ৫০ দিন পরে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। তিনি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ এবং স্নেহময়ী মা আমেনা তাঁর নাম রাখেন আহমাদ।

ধাত্রী হালিমার গৃহে শিশু মুহাম্মাদ (সা.)

তৎকালীন আরবের প্রথা অনুসারে শিশু মুহাম্মাদ (সা.)-কে লালন-পালনের জন্য বনু সাদ গোত্রের বিবি হালিমার নিকট অর্পণ করা হয়। এ সময়ে বিবি হালিমার পরিবার কিছুটা অভাবগ্রস্ত ছিল। শিশু মুহাম্মাদ (সা.)-এর বরকতে অভাব দূর হয়ে প্রাচুর্যে ভরে ওঠে তার সংসার। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বিবি হালিমা তাঁকে নিজ সন্তানের ন্যায় আদর-যত্নে লালন-পালন করেন। এরপর শিশু মুহাম্মাদ (সা.) মা আমেনার গৃহে ফিরে আসেন। মা হালিমার গৃহে অবস্থানকালে শিশু বয়সেই তাঁর মধ্যে ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। তিনি মাতৃদুগ্ধ পান করার সময় বিবি হালিমার বামপাশের দুগ্ধ পান করতেন। অন্য পাশ থেকে কখনই পান করতেন

না; তাঁর দুধ ভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন। মা হালিমার গৃহে থাকাকালে ৩ বছর বয়সে দুজন ফেরেশতা তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে মানবীয় সকল দুর্বলতা মুক্ত করে কুদরতি শক্তি ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে দেন। ধাত্রী মা হালিমার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল। তিনি নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভের পরেও দুধ মা হালিমা ও তাঁর পরিবারকে অত্যন্ত সম্মান ও সহায়তা করতেন।

মা আমেনার মৃত্যু ও এতিম মুহাম্মাদ (সা.)

মাতৃগৃহে ফিরে আসার পর মায়ের সীমাহীন আদর-ভালোবাসায় বালক মুহাম্মাদ (সা.) বড় হতে লাগলেন। তিনি ৬ বছর বয়সে পিতার কবর যিয়ারতের জন্য মায়ের সাথে মদিনায় যান। সেখান থেকে মক্কায় ফেরার পথে মা আমিনা ইন্তেকাল করেন। ফলে তিনি পিতা-মাতা উভয়কে হারিয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এসময় দাদা আবদুল মুত্তালিব এতিম মুহাম্মাদের লালন-পালনের দায়িত্ব নিলেন। দাদা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ-ভালোবাসায় লালন-পালন করতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর আট বছর বয়সে দাদাও ইন্তেকাল করেন। এরপর তিনি চাচা আবু তালেবের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে থাকেন।

আল-আমিন উপাধি লাভ ও বুহাইরা পাদ্রীর ভবিষ্যদ্বাণী

বাল্যকালে মহানবি (সা.)-এর মধ্যে চারিত্রিক উত্তম গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। তাঁর কোমল স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারে সবাই তাঁকে আদর-স্নেহ করতেন। তিনি সবাইকে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। সর্বদা হাশি-খুশি থাকতেন, সকলের কষ্টে ব্যথিত হতেন। সদা সত্য কথা বলতেন, কখনো মিথ্যা বলতেন না। এজন্য শৈশবেই তাঁকে সবাই আল-আমিন বা পরম বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত করেন।

১২ বছর বয়সে কিশোর মুহাম্মাদ (সা.) চাচা আবু তালেবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেন। পথে বুহাইরা নামক জনৈক খ্রিষ্টান পাদ্রীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। খ্রিস্টান পাদ্রী তাঁকে শেষ জামানার নবি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হিসেবে চিনতে পারেন। তিনি আবু তালেবকে পরামর্শ দেন তিনি যেন এই বালককে পৌত্তলিক ইয়াহুদিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন; তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। তাই চাচা আবু তালেব পাদ্রীর পরামর্শ মোতাবেক মহানবি (সা.)-কে মক্কায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা ও হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন

শৈশব থেকেই মহানবি (সা.) আরব জাতির চারিত্রিক অধঃপতন লক্ষ করেছেন। এ সময়ে হরবে ফুজ্জারের ভয়াবহতা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন; তাঁর মন বিগলিত হয়। তাই তিনি সমাজের অরাজকতা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তিনি কতিপয় যুবককে নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' (حِلْفُ الْفُضُوْلِ) নামে একটি যুব শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংঘের মাধ্যমে তিনি মুসাফিরদের নিরাপত্তা, মজলুম ও অসহায়ের সহায়তা এবং অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও আরবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তিনি যে ভবিষ্যৎ জীবনে শান্তির অগ্রদূত হবেন, এ সাংগঠনিক তৎপরতা তাই প্রমাণ করে।

ছোটবেলা থেকেই মহানবি মুহাম্মাদ (সা.) অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন একজন

যুবক, সে সময় মক্কার গোত্রপ্রধানরা মিলে পবিত্র কাবা ঘর সংস্কারের কাজ শুরু করেন। কাবা ঘর সংস্কারের কাজ সমাপ্ত হলে পবিত্র হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) যথাস্থানে স্থাপন করা নিয়ে গোত্রসমূহের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। অবশেষে গোত্রপ্রধানরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, আগামীকাল সকালে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কাবা চত্বরে প্রবেশ করবেন, তিনিই এ বিবাদ মীমাংসা করবেন। সকালবেলা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সবার আগে কাবা চত্বরে প্রবেশ করলেন। এটা দেখে সবাই সন্তুষ্ট হলো। তিনি তাঁর চাদরের মাঝখানে পবিত্র পাথরটি রেখে সকল গোত্রের সরদারকে চাদরের চারপাশ ধরতে বললেন। তারা সকলে মিলে চাদরটি ধরে যথাস্থানে নিয়ে গেল, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজ হাতে পাথরখানা কাবার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন। ফলে আরব জাতি একটি ভয়াবহ যুদ্ধ থেকে রক্ষা পেল এবং সকলে পাথরটি বসানোর গৌরব লাভ করল।

বিবি খাদিজার সাথে বিবাহ

তৎকালীন আরবে খাদিজা (রা.)-এর সচ্চরিত্রের যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি নিষ্কলুষ চরিত্রের জন্য তাহিরা বা পুণ্যবতী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর সততা ও আমানতদারিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তার ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর নেতৃত্বে ব্যবসায় প্রচুর সাফল্য আসে। তাছাড়া তাঁর অমায়িক ব্যবহার, সততা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি তাঁর প্রতি আরও বেশি মুগ্ধ হয়ে যান। ফলে খাদিজাতুত তাহিরা তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) চাচা আবু তালেবের পরামর্শে এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন। এ সময় খাদিজা (রা.) বয়স ছিল ৪০ বছর আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর বয়স ছিল ২৫ বছর।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) শৈশব হতেই সমাজকে পাপাচার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি প্রায়শ মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় গভীর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। অবশেষে ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র রমযান মাসের লাইলাতুল কদরে ওহি প্রাপ্ত হন। হযরত জিবরাইল (আ.) তাঁকে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করে শোনান; তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। নবুওয়াত লাভের পর তিনি মহান আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত ও ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

মহানবি (সা.)-এর শৈশব-কৈশোর থেকে আমাদের শিক্ষণীয়

মহানবি (সা.) -এর শৈশব-কৈশোরের অনুপম চরিত্রিক মাধুর্যে আমাদের জন্য অনুসরণীয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো–

১। আমরা ন্যায়বিচার করব ও অপরের অধিকার আদায়ে সর্বদা সচেষ্ট হবো;
২। ছোট-বড় সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করব, সকলকে সম্মান করব ও ভালোবাসব; কাউকে অপমান করব না;
৩। সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করব; পরিবারের কাজে সহযোগিতা করব;
৪। পরিবার ও সমাজে শান্তিবিনষ্টকারী কোনো আচরণ করব না;
৫। সদা সত্য কথা বলব; কারও আমানত নষ্ট করব না;
৬। বন্ধু ও সহপাঠীরা মিলে ভালো কাজ করার চেষ্টা করব; কোনো অন্যায় করব না;

৭। অসহায় ও অত্যাচারিত মানুষকে সাহায্য করব এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করব;
৮। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করব;
৯। সর্বোপরি ইসলামি আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ব।

হযরত আবু বকর (রা.)

জন্ম ও পরিচয়

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবু বকর এবং উপাধি সিদ্দিক বা সত্যবাদী। হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন বয়সের দিক থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর চেয়ে তিন বছরের ছোট। মহানবি (সা.)-এর প্রায় সমবয়সী হওয়ায় বাল্যকাল থেকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর পিতা।

হযরত আবু বকর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

একদা হযরত আবু বকর (রা.) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে গমন করেন। মক্কায় ফিরে শুনলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেছেন। এ ঘটনার কথা শুনে সাথে সাথেই তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে হাজির হয়ে কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, তার মধ্যেই কিছুটা সংকোচ লক্ষ্য করেছি, কেবল আবু বকর ছাড়া। তিনি ইসলামের আহ্বানে নির্দ্বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া মিরাজের অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করে কাফিরগণ আবু বকর (রা.) কে বললেন, এবার কী বলবে, তোমার বন্ধু বলেছে উনি নাকি এক রাতে সিরিয়া গিয়ে আবার ফেরতও এসেছেন। আবু বকর (রা.) বললেন, মহানবি (সা.) যদি বলেন, সাত আসমানের ওপরে গিয়েছেন, তবুও আমি বিশ্বাস করি। তখন মহানবি (সা.) তাকে 'সিদ্দিক' বা মহাসত্যবাদী উপাধি দেন।

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন স্বল্পভাষী, ধৈর্যশীল, সাহসী, পরোপকারী, বিচক্ষণ, দয়ালু, বৃদ্ধদের প্রতি যত্নশীল। তিনি যখন খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফা ছিলেন, তখনকার একটা ঘটনা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। মদিনায় বসবাস করতেন এক অসহায় বৃদ্ধ অন্ধ মহিলা। তিনি খুবই নিঃস্ব ও হতদরিদ্র এবং বয়সের ভারে দুর্বল ছিলেন। বৃদ্ধার কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। বৃদ্ধার করুণ অবস্থা শুনে হযরত উমর (রা.) তার সেবা করা শুরু করলেন। প্রতিদিন তাকে খাওয়ানো ও অন্যান্য যত্ন শুরু করলেন। হঠাৎ একদিন দেখলেন, বৃদ্ধার সকল কাজ কেউ করে গেছে। দ্বিতীয় দিনও দেখলেন, বৃদ্ধার যত্ন করা হয়ে গেছে। তখন বৃদ্ধাকে হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কে তার এই সকল কাজ করেছেন। তখন বৃদ্ধা বললো, আমি তো চোখে দেখি না তবে লোকটি খুব

যত্নের সঙ্গে আমার সকল কাজ করেছেন এবং তিনি খুব ভালো ব্যবহার করেছেন। হযরত উমর (রা.) বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবলেন কে এই কাজ করেছেন? তিনি গোপনে পরের দিন দেখলেন, স্বয়ং খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) অতিযত্নে অসহায় অন্ধ বৃদ্ধা মহিলার সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করে চলে যাচ্ছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম মুসলিম পুরুষ। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি সিদ্দিক (সত্যবাদী) এবং আতিক (দানশীল) উপাধি লাভ করেছিলেন। নবি করিম হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওফাতের তিনি প্রথম খলিফার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও শাসনের ফলে ইসলামের শত্রুরা ধ্বংস হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য অনেক শক্তিশালী করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই মহান ব্যক্তিত্বের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

দলগত কাজ: হযরত আবু বকর (রা.) এর উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো এবং নিজেদের জীবনে অনুশীলন করো।

হযরত খাদিজা (রা.)

জন্ম ও পরিচয়

হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন মহানবি (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী। তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আবদুল উজজ্যা নামক পরিবারে ৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের ইতিহাসে যে কয়জন সম্মানিত নারী রয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

হযরত খাদিজা (রা.) আরবের একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন পণ্যের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় তৎকালীন শাম দেশ তথা বর্তমান সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময় লোক নিয়োগ করতেন। তিনি মহানবি (সা.)-এর সততা, আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার কথা শুনে তাঁকে তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ করেন। মহানবি (সা.) তাঁর ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে বিবাহ

হযরত খাদিজা (রা.) যুবক মুহাম্মাদ (সা.)-এর সততা, বিশ্বস্ততা, উন্নত চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে ২০টি উট মোহরের বিনিময়ে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর সকল সম্পদের দায়দায়িত্ব রাসুল (সা.)-এর উপর ছেড়ে দেন এবং তাঁকে ইচ্ছামতো সম্পদ খরচ করার অনুমতি দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ঐ সম্পদ অসহায় ও গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেন।

চারিত্রিক গুণাবলি

তিনি একজন আদর্শ নারী, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ ব্যবসায়ী ও আদর্শ মা ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) জাহিলি যুগে জন্মগ্রহণ করেও সৎ চরিত্রের অধিকারি ছিলেন। কখনো কোনো অন্যায় ও অসৎ কাজ করেননি। মহানবি (সা.) –এর প্রতি তাঁর প্রবল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল।

তিনি নারীদের কল্যাণমূলক কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি বিধবা নারীদেরকে আশ্রয় দিতেন ও অবহেলিত নারীদেরকে নিজ বাড়িতে শিক্ষা দিতেন। তিনি অবসর সময়ে সেলাই করতেন।

তিনি ছিলেন একজন দানশীল ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি শিশু, অসহায় ও এতিমদের ভালোবাসতেন। ইসলামের কল্যাণে তাঁর সকল সম্পদ দান করার কারণে আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.)–এর স্বামীভক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি রাসুল (সা.)-এর সকল কাজে শক্তি ও সাহস যোগাতেন। বিপদে-আপদে কাছে থাকতেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত খাদিজা (রা.) নারীকুলের গৌরব। তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তিনি জীবিতকালেই বেহেশতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। খাদিজা (রা.)-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) জান্নাতে নারীদের সর্দার। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্মানে বলেন, 'আল্লাহ খাদিজার চেয়ে কোনো মহৎ নারী আমাকে দেননি। তিনি এমন সময় আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন, যখন সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিল। আমার বিপদের সময় সবাই যখন আমাকে পরিত্যাগ করেছে, তখন তিনি আমাকে সমর্থন ও অর্থ সাহায্য করেছেন।' (মুসনাদে আহমদ)। মহানবি (সা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, 'বিশ্বের সকল নারীর উপর যে চারজন নারীর সম্মান রয়েছে তন্মধ্যে হযরত খাদিজা (রা.) অন্যতম।'

হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন রাসুল (সা.)-এর সকল বিপদের বিশ্বস্ত সাথী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জাহেলি যুগের কোন প্রকার অন্যায় ও পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আজও বিশ্বের নারীদের জন্য অনুপম আদর্শ।

দলগত কাজ: বিবি খাদিজা (রা.)- এর চরিত্রের উত্তম গুণাবলির আলোকে একটি পোস্টার তৈরি করো।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

যে সকল মনীষী তাঁদের জ্ঞান-গবেষণার জন্য মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে ফিকহ শাস্ত্রের জনক বলে হয়। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমরা তাঁর জীবনাদর্শ জানব।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৮০ হিজরি সনের ৪ শাবান মোতাবেক ৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম নুমান, পিতার নাম সাবিত। দাদার নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয় নুমান। তিনিই পরবর্তীকালে ইমাম আযম আবু হানিফা নামে জগদ্বিখ্যাত হন।

জ্ঞানার্জন

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। একবার যা পড়তেন বা শুনতেন তা মুখস্থ হয়ে যেতো। তিনি বাল্যকালেই পবিত্র কুরআন হিফয করেছিলেন। ইমাম শা'বীর পরামর্শে তিনি ইলমুল কালাম, পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা ও সিরিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদিসের জ্ঞান লাভ করেন। পবিত্র হজ উপলক্ষে মক্কা শরিফে এলে বিভিন্ন দেশের মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের সাথে জ্ঞানের আদান-প্রদান করতেন। তিনি কয়েকজন সাহাবির সাক্ষাত পান। তাই তাকে তাবে'ঈ গণ্য করা হয়।

ফিকহ শাস্ত্রে অবদান

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবক এবং হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ইবাদাত ও আমলসমূহ আমরা যাতে সঠিকভাবে পালন করতে পারি সেজন্য তিনি কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত শরিয়তের বিধি-বিধানকে অত্যন্ত সহজ করে গ্রন্থিত করেন। এজন্যই বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান তাঁর মাযহাবকে অনুসরণ করেন। তাঁর উদ্ভাবিত ফাতওয়া হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রায় ৮৩ হাজার মাসআলার সমাধান করে গেছেন। তাঁর মাযহাবই সারা বিশ্বে সমাদৃত ও সহজ পালনীয়। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফারসহ আরও অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহ তাঁর শিষ্য ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি ইলম ফিকহের ব্যাপক জ্ঞানার্জন করতে চায় সে যেন অবশ্যই ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্যদের সান্নিধ্য গ্রহণ করে। ইমাম আবু হানিফা হাদিস শাস্ত্রে 'হাফেযুল হাদিস' ছিলেন। তার সহিহ হাদিস সংকলন- 'মুসনাদ আল-ইমাম আবি হানিফাহ' একটি অমূল্য গ্রন্থ।

চারিত্রিক গুণাবলি

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিয়মিত রাত্রি জাগরণ করে তাহাজ্জুদ সালাত ও আল্লাহর যিকির করতেন। তিনি কখনো গিবত বা পরনিন্দা করতেন না। কখনো কারও সম্পর্কে আলোচনা করলে তার ভালো দিকটাই আলোচনা করতেন।

তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বদা সততা বজায় রাখতেন; পণ্যের দোষ-ত্রুটি কখনো গোপন করতেন না। তিনি ওয়াদা ও আমানত রক্ষা করতেন। ঋণী ব্যক্তিকে অবকাশ দিতেন, অধিকাংশ সময় তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। তিনি খুব সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তিনি খুব নম্র ও বিনয়ী ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একজন মুত্তাকি ও পরহিযগার ছিলেন। হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সবসময় নিজেকে পবিত্র রাখতেন। অধিকাংশ সময় চিন্তামগ্ন ও চুপ থাকতেন। তিনি দানশীল ও দয়ালু ছিলেন।

পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তিকে তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করতেন। তাঁকে খলিফা মানসুর বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ জন্য খলিফা তাঁকে জেলে আটক করে রাখেন। কোনো কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে খলিফা তাঁকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করেন। এই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৫০ হিজরিতে সিজদাহরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

আমরা এই মহান মনীষীর জীবনাদর্শ ভালভাবে জানব এবং তাঁর উন্নত নৈতিক আচরণগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবো।

দলগত কাজ: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করো এবং নিজেদের জীবনে অনুশীলন করো।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) ইসলামের অন্যতম প্রধান সাধক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গাউসুল আজম বড় পীর হিসেবেই সকলের নিকট পরিচিত। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা আজ ইসলামের এ মহান সাধকের জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানব।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) হিজরি ৪৭০ সালে রমযান মাসের ১ তারিখ মোতাবেক ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমি জিলানের নামানুসারেই তাঁকে জিলানী বলা হয়। তাঁর উপাধি গাউসুল আজম, মুহিউদ্দিন বা দ্বীনের পুনরুজ্জীবক ইত্যাদি। তাঁর পিতা আবু সালেহ মুসা জঙ্গী এবং মাতা উম্মুল খায়ের ফাতিমা। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর বংশধর ছিলেন।

ব্যতিক্রমী শৈশব

শৈশবে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) -এর মধ্যে শিশুসুলভ চাঞ্চল্য ছিল না। তিনি ছিলেন শান্ত, নম্র, ভদ্র ও স্থির স্বভাবের অধিকারী। জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি মায়ের কোলে থাকতে শুনেশুনে ১৮ পারা কুরআন মাজিদ মুখস্থ করে ফেলেন। সাত বছর বয়স থেকে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে শুরু করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি ১৮ বছর বয়সে বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আরবি সাহিত্য, ইতিহাস ও আকিদা বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

সত্যবাদিতা

তিনি সদা সত্য কথা বলতেন, কখনো মিথ্যা বলতেন না। তিনি পড়াশুনার জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে বাগদাদ আসার পথে একটি ডাকাত দলের কবলে পড়েন। ডাকাত সর্দার অন্যদের সবকিছু নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথে কি আছে? তিনি বললেন, আমার নিকট ৪০টি স্বর্ণ মুদ্রা আছে। ডাকাত সর্দার আশ্চর্যান্বিত হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন হে যুবক! তুমি তো মিথ্যা কথা বলে আমার নিকট থেকে স্বর্ণ মুদ্রা লুকাতে পারতে? তখন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বললেন, আমার মা মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তাঁর এ সত্যবাদিতা দেখে ডাকাত দলের মনে পরিবর্তন আসল এবং তারা সবাই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে এ পাপের পথ ছেড়ে দিল এবং পুণ্যের পথে তাদের জীবন পরিচলনা শুরু করল।

অধ্যাত্মিক সাধনা ও ইসলাম প্রচার

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) একজন মহান সাধক ছিলেন। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সুফিসাধক হযরত হাম্মাদ (র.)-এর নিকট সুফিতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করেন। তিনি একটানা ২৫ বছর মুরাকাবা-মুশাহাদা ও কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত থাকেন।

তিনি জীবনের বাকি সবটুকু সময় ইসলামের সেবায় নিয়োগ করেন। তিনি বিভিন্ন জনসভার আয়োজন করে বক্তৃতা ও উপদেশ দিতে থাকেন। মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিমরাও তাঁর সভায় আসতেন। তাঁর দাওয়াতে প্রায় ৫ হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটি মুবাল্লিগ দল তৈরি করেন। তাঁদের দাওয়াতে বিমোহিত হয়ে সুদান, নাইজেরিয়া, চাদ, ক্যামেরুনের অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় এগারোটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করেন।

ইবাদাত

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা করতেন। প্রত্যহ কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতেন; রাতের অধিকাংশ সময় জিকির ও ইবাদাত বন্দেগীতে কাটাতেন। নিষিদ্ধ পাঁচ দিন ব্যতীত সারা বছরই তিনি রোযা পালন করতেন।

অসহায়দের সাহায্য

তিনি গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের সেবা করতেন; তাদেরকে অকাতরে দান করতেন। তাঁর শিক্ষাজীবনে একবার বাগদাদে অভাব দেখা দেয়। তিনি তাঁর সকল স্বর্ণমুদ্রা গরীব-দুঃখী ও অসহায় মানুষকে দান করে দেন এবং নিজে না খেয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি নিজে পেটপুরে খাওয়া আর প্রতিবেশী অনাহারে থাকাকে অপছন্দ করতেন।

মৃত্যু

ইসলামের এ মহান সেবক ৯০ বছর বয়সে ৫৬১ হিজরি সনের ১১ রবিউস সানি ইন্তেকাল করেন। বর্তমান ইরাকের বাগদাদ শহরে তাঁর মাজার রয়েছে।

এ পাঠ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয়:

- আমরা বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রা.)- এর আদর্শে আমাদের জীবন গড়ব;
- সদা সর্বদা সত্য কথা বলব, কখনো মিথ্যাচার করবো না;
- গরিব, অসহায়, অভাবী ও দুস্থদের সাহায্য ও সেবা করব;
- মাতাপিতার কথা শুনব, তাঁদের আদেশ মেনে চলব;
- মহান আল্লাহর ইবাদাত করব।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর জীবনাদর্শ থেকে নিজেদের জন্য পালনীয় কাজের একটি তালিকা তৈরি করবে।

প্রতিবেদন রচনা

আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায় থেকে আমরা যা কিছু শিখলাম এবং যে সকল কাজ করলাম সেগুলো মিলিয়ে আমাদের এবার একটি বড় কাজ করতে হবে। এবার আমরা নিজেরা ঠিক করব যে আমরা এসকল আদর্শ জীবনচরিত থেকে কি শিক্ষা লাভ করলাম এবং সেগুলো কোন কোনটি আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে চাই। অর্থাৎ এখন তোমাকে ভেবে দেখতে হবে, মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত খাদিজা (রা.), ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর জীবন সম্পর্কে তুমি যা যা জেনেছ তার মধ্যে থেকে কি কি কাজ তুমি তোমার জীবনে চর্চা করতে চাও। তাহলে এখন তোমার কাজ হলো-

কাজ-১৫: জীবনাদর্শ থেকে তুমি অনুসরণ করতে চাও এমন দিকগুলো নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করো।

অর্থাৎ আমাদের এখন ঠিক করতে হবে যে, জীবনীগুলো থেকে আমরা যা যা জানলাম সেগুলোর মধ্যে থেকে বিশেষ কোনগুলোর প্রতিফলন আমরা আমাদের জীবনে দেখতে চাই। সেই দিকগুলোকে তুলে নিয়ে আমরা এবার একটি প্রতিবেদন তৈরি করব এবং শিক্ষককে দেখিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবো। যা যা লিখেছি সেই অনুসারে আমরা এবার আমাদের জীবনকে পরিবর্তনের চেষ্টা করব। সময়ে সময়ে আমরা আমাদের এই প্রতিবেদনের লেখার সাথে মিলিয়ে দেখব যে যা যা অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম সেগুলো আসলেই অনুসরণ করতে পেরেছি কিনা। না পেরে থাকলে সেগুলো আবার নতুন করে চর্চা শুরু করব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সহাবস্থান

প্রিয় শিক্ষার্থী,

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষাবর্ষ প্রায় শেষ। তোমরা এবছর অনেক নতুন নতুন বিষয় শিখেছ। এবার তোমরা আরেকটি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। তোমরা এবার দেখবে এবং শিখবে কিভাবে আমরা আমাদের দেশে সকলে মিলেমিশে একত্রে বসবাস করি। এটা জানতে এবং ভালোভাবে বুঝতে শিক্ষক তোমাদের কিছু কাজ দিবেন, কিছু জিনিস দেখাবেন। তোমার দায়িত্ব হলো সবগুলো কাজ মনোযোগ দিয়ে করা এবং উপলব্ধি করতে চেষ্টা করা।

যেখানে সবাই সেবা পায়

এই অভিজ্ঞতার শুরুতেই শিক্ষক তোমাদের সকল বন্ধুকে কোনো একটি রক্তদান কেন্দ্র/সেবাকেন্দ্র/স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। এটা হবে তোমাদের জন্য একটি ফিল্ড ট্রিপ। ফিল্ড ট্রিপটি কবে কখন হবে তা শিক্ষক তোমাদেরকে সময়মত জানিয়ে দিবেন। তোমার কাজ হলো শিক্ষকের নির্দেশ মতো সেদিন প্রয়োজনীয় খাতা, কলম, খাবার/পানি ইত্যাদি নিয়ে ফিল্ড ট্রিপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।

লক্ষ করো

রক্তদান কেন্দ্র/সেবাকেন্দ্র/স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/হাসপাতালে অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত মানুষ বেশি আসে। তাই সেসব জায়গায় চলাফেরা করার সময় তোমরা বন্ধুরা একসাথে সারিবদ্ধ ভাবে চলার চেষ্টা করবে এবং কোনো প্রকার হইচই যেন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখবে। যতক্ষণ সেখানে থাকবে ততক্ষণ তোমাদের কাজ হবে আশেপাশের সবাই কে কি করছে তা মনোযোগ দিয়ে দেখা। তোমাদের সাথে যদি কোনো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বন্ধু থাকে তাহলে তোমরা আশেপাশে যা দেখতে পাচ্ছ তা তাকে জানাও। যদি এমন কিছু দেখো যেটা তোমাদের মনে দাগ কাটে, তাহলে সেটা নিজের নোটখাতায় লিখে নাও। তারপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে সবাই শৃংখলাবদ্ধভাবে বাড়ি/বিদ্যালয়ে ফিরে যাও।

তবে কোনো কারণে যদি শিক্ষক তোমাদের বাইরে ফিল্ড ট্রিপে নিয়ে যেতে না পারেন, তাহলেও মন খারাপ করো না। ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে তোমরা যা দেখতে তা শ্রেণিকক্ষে বসেই দেখানোর ব্যবস্থা শিক্ষক করবেন।

দলগত কাজ ও উপস্থাপনা

ফিল্ড ট্রিপ থেকে ফেরার পর (বা ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে যা দেখতে তা ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে দেখার পর) শিক্ষক তোমাদের কাছে তোমাদের অনুভূতি জানতে চাইবেন। সেগুলো গুছিয়ে শিক্ষককে বলার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে তোমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কাজটি করবে। তাহলে এবারের কাজ হলো–

কাজ- ১৬: নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো।

- ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে তোমরা কি দেখেছ?
- কাকে কাকে সেবা দেওয়া হচ্ছে?
- এমন কাউকে কি দেখেছ যাকে সেবা দেওয়া হয়নি?
- যা যা দেখেছ তা কেন হচ্ছে বলে তুমি মনে করো?

সবগুলো দলের পোস্টার বানানো হয়ে গেলে শ্রেণিকক্ষে সবাই তা প্রদর্শন করবে এবং শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে সবাই অন্য সব দলের পোস্টারে কি লেখা আছে তা দেখবে।

পোস্টার প্রদর্শনী শেষ হলে শিক্ষক তোমাদের সাথে কিছু আলোচনা করবেন। শিক্ষকের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনে বোঝার চেষ্টা করবে।

মুক্তিযুদ্ধে আমরা সবাই

শিক্ষক তোমাদেরকে এবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি পোস্টার দেখাবেন। পোস্টারটি দেখে পোস্টারে লেখা কথাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করবে এবং কথাগুলোর মূল অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে। তোমরা যে সেবাকেন্দ্রটি দেখেছিলে, সেখানে যা যা দেখেছ সেটার সাথে কি পোস্টারটি কোনোভাবে সম্পর্কিত কিনা সেটাও বোঝার চেষ্টা করবে। প্রয়োজন হলে শিক্ষককে বিভিন্ন প্রশ্ন করে পোস্টারটি সম্পর্কে আরও জেনে নিবে। শিক্ষক পোস্টারটি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করার পর তোমাদেরকে একটি বাড়ির কাজ দিবেন। তোমাদের কাজ হলো–

কাজ-১৭: তোমাদের পরিচিতজনদের মাঝে কোনো মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে বের কর এবং তার সাক্ষাৎকার নাও। এক্ষেত্রে তুমি তাকে নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারো।

- আপনি কেন যুদ্ধে গিয়েছিলেন?
- ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই কি যুদ্ধে গিয়েছিল?
- সব ধর্মের মানুষরা কি যুদ্ধে গিয়েছিল?
- সব ধর্মের সবাই কি একসাথে মিলে এক হয়ে যুদ্ধ করেছিল?

লক্ষ করো:

যদি তোমাদের পরিচিতজনদের মাঝে কোনো মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে না পাও তাহলে বড় কারও সাহায্য নিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে বের করো।

কাজ-১৭ হয়ে গেলে, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়ে গেলে এবার সেই মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে যে সকল তথ্য পেলে সেগুলো এবং সেবাকেন্দ্র/হাসপাতালে ফিল্ড ট্রিপ থেকে যা জানলে সেগুলো একত্র করো। এরপর এসকল তথ্য থেকে সব ধর্মের মানুষের মিলেমিশে থাকার ব্যাপারে যা যা বুঝতে পেরেছ তা বাড়ির কাজের খাতায় লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দিবে। এই দুটো কাজ থেকে তোমরা সকল ধর্মের মানুষের মিলেমিশে বসবাসের ব্যাপারে কি কি জেনেছ সেটাই হবে তোমার বাড়ির কাজের মূল বক্তব্য। শিক্ষক বাড়ির কাজ দেখে তোমাদের সাথে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

সকল ধর্মে সহাবস্থান

পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে। আর আমাদের ইসলামের মতো সকল ধর্মেই সবাইকে মিলেমিশে একত্রে বসবাস করতে বলা হয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার বা ভালো আচরণ করা হলো আখলাকে হামিদাহ, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয় কাজ। এবার তাহলে এসো দেখি, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হবে সে ব্যাপারে ইসলামে আর কি কি বলা হয়েছে।

ইসলামের আলোকে সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

এই অংশের প্রথম দুটি সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ইসলাম ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান সম্পর্কে যা যা বলা আছে তা জানাবেন। এক্ষেত্রে আখলাক অধ্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা অন্য ধর্মালম্বীদের সাথে ভালো আচরণ সম্পর্কে যা জেনে এসেছে তা শিক্ষক তাদের মনে করিয়ে দিবেন। পাশাপাশি অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সহাবস্থান সম্পর্কে ইসলামের নিম্নোক্ত শিক্ষা তুলে ধরবেন।

সকল মানুষ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। এ হিসেবে মানবজাতির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক হলো ভ্রাতৃত্বের। আমরা মুসলিম। এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। এটি যেমন ইসলামি ভ্রাতৃত্ব; তেমনি এর বাইরেও মানুষ হিসেবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথেও রয়েছে আমাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি হচ্ছে– সকল মানুষ একে অপরের ভাই। তাই সমাজে বসবাস, চলাফেরা, ওঠাবসা, আদান-প্রদান, লেন-দেন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তির ধর্ম বিচার্য নয়, বরং বিচার্য হচ্ছে সে একজন মানুষ। মানবতার ধর্ম ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে এ বোধ ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ এবং সকল মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উদার আচরণ কামনা করে।

ধর্ম গ্রহণে সকল মানুষ স্বাধীন। মহান আল্লাহ বলেন, 'দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬)। অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,'সুতরাং যার

ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার যা ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক' (সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ২৯)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন' (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৮)।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত বাণী থেকে স্পষ্ট হয় যে, কোনো মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বধর্ম ত্যাগে বাধ্য করা ইসলামের নীতি নয়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন। প্রত্যেকেই ধর্ম প্রচারের সুযোগ পাবে। এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের প্রতি ধর্মের কোনো ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করা যাবে না।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থান ও মানবিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মহানবি (সা.) মদিনার মুসলিম, ইহুদী-খ্রিষ্টান-পৌত্তলিকদের সমন্বয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি মদিনার সনদ নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে সবার জান-মালের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

মহানবি (সা.)-এর যুগে অন্য ধর্মের অনুসারীরা মসজিদে যাতায়াত করত। একদা সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মহানবি (সা.)-এর নিকট আসে। অতঃপর তারা মসজিদের গম্বুজের নিকট অবস্থান নেয়। সালাতের সময় হলে লোকজন বলল, হে আল্লাহর রাসুল! সালাতের সময় হয়েছে, অথচ একদল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মসজিদে অবস্থান করছে। তিনি বলেন, অমুসলিমের কারণে তা অপবিত্র হয়ে যায় না (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা)। আরও উল্লেখ্য, নবম হিজরিতে মহানবি (সা.)-এর নিকট নাজরান থেকে চৌদ্দ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আসে। তিনি তাদেরকে মসজিদে বসার অনুমতি দেন। তারা ঐ মসজিদেই তাদের প্রার্থনা করে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, মসজিদে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রবেশে কোনো বাধা নেই।

ইসলাম ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ এলাকা ও পরিমন্ডলে স্ব স্ব ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের অধিকার প্রদান করেছে। মুসলিম জনপদের অভ্যন্তরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় থাকলে তাতেও তারা তাদের উপাসনা করতে পারবে। তারা তাদের জনপদের মধ্যে নতুন উপাসনালয়ও তৈরি করতে পারবে। তাতে বাধা প্রদান করা এবং তাদের উপাসক ও উপাসনালয় এর ওপর আক্রমণ করা পাপের কাজ। ইসলামের নামে যারা এ ধরনের কাজ করে তারা ধর্মান্ধ এবং সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী। যেমন উমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) ঘোষণা করেছেন, 'তারা যেন কোনো উপাসনালয়, গির্জা কিংবা বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ না করে' (আল-মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ, ৭/১২৯)।

অন্য ধর্মের অনুসারীরা মুসলিম নাগরিকের ন্যায় রাষ্ট্রের সবধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবে। দেশের সকল আইন-বিধান মেনে চলার পরও কেবল ভিন্ন ধর্মের লোক হওয়ার কারণে তার সাথে অন্যায় আচরণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে মহানবি (সা.) বলেন, 'সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে অথবা তার প্রাপ্য কম দিবে অথবা তাকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ করতে বাধ্য করবে অথবা তার সম্মতি ছাড়া তার নিকট থেকে কিছু আদায় করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো' (আবূ দাউদ)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিগণ ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের বিপদে-আপদে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করতেন। মৃতব্যক্তির পরিবারের খোঁজখবর নিতেন। বিভিন্ন সময় তাদেরকে উপহার সামগ্রী পাঠাতেন এবং তাদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'তার জন্য একটি ছাগল যবেহ করা হলে তিনি তার গোলামকে বলেন, তুমি কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে তা দিয়েছ? কেননা আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: জিবরাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অবিরাম নসিহত করতে থাকেন। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, তিনি হয়ত তাকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন' (আদাবুল মুফরাদ)।

মহানবি (সা.) মুসলিম-অমুসলিম বিবেচনা না করে সবাইকে মানুষ হিসেবে সম্মান করতেন। হাদিসে উল্লেখ আছে, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ অতিক্রম করল। তা দেখে নবি (সা.) দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। অতঃপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! এটা তো এক ইহুদীর লাশ। তিনি বলেন, তোমরা লাশ দেখলে দাঁড়াবে (বুখারি)। অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, তিনি বলেন, সে কি মানুষ নয়? (আল-মুসনাদ লি-আহমাদ)। উপরোক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহানবি (সা.) একজন অমুসলিমের প্রতিও কতটা সম্মান প্রদর্শন করতেন।

ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কারও সাথে বেইনসাফ কিংবা অন্যায় আচরণের নির্দেশনা দেয় না। ইসলামে অমুসলিমদের জন্য ধর্ম পালন, বিপদাপদে সাহায্য প্রদান, সৌজন্যমূলক হাদিয়া প্রেরণ, ন্যায়বিচারসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভাজন না করে একইসঙ্গে চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া ও লেনদেনের অবকাশ রাখা হয়েছে এবং তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে যাতে করে বিপদাপদে তারা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে পাশে থাকতে পারে। মানুষ হিসেবে মানুষকে সম্মান করা ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে, তা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা অন্য যে কোনো ধর্মের অনুসারী হোক না কেন।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে যখন ভিন্ন ধর্মের কোনো লোক অসুস্থ বা বৃদ্ধ হয়ে কর্মে অক্ষম হয়ে যেত, তখন তিনি তার বার্ষিক 'কর' মওকুফ করে দিতেন এবং বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করে দিতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এক গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এক অসহায় বৃদ্ধ তার পেছন থেকে ধরে বসল। ওমর (রা.) বিনয়ের সঙ্গে বললেন, তুমি কোন ধর্মের অনুসারী? সে বলল, ইহুদি। জিজ্ঞেস করলেন, কি দরকার? বৃদ্ধ বললেন, কর মওকুফ, কিছু সাহায্য ও বার্ধক্য ভাতা। ওমর (রা.) তাকে সর্বপ্রথম নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ও সাহায্য প্রদান করলেন। এরপর বায়তুল মালের হিসাবরক্ষকের কাছে তাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'এ বৃদ্ধ এবং তার মতো আরও যত বৃদ্ধ আমাদের দেশে আছে, সবার কর মওকুফ করে দাও এবং খাদ্যভাণ্ডার থেকে তাদের সাহায্য করো। এমন ব্যবহার কিছুতেই সমীচীন নয় যে, আমরা তাদের যৌবনে শুল্ক গ্রহণ করে বার্ধক্যে তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবো।'

তাহলে, ইসলাম ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান বা মিলেমিশে থাকার ব্যাপারে কি বলা আছে তা তো আমরা জানলাম। এবার শিক্ষক তোমাদেরকে হিন্দু ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের সবার সাথে মিলেমিশে থাকার ব্যাপারে কি বলা হয়েছে তা জানাবেন।

বই-এর পাঠ এবং শিক্ষকের আলোচনা থেকে চারটি ধর্মের ধর্মীয় সহাবস্থান বা অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি ভালো আচরণের ব্যাপারে যা যা বলা হয়েছে সেগুলো অনুসারে নিচের ছকটি পূরণ করো–

ইসলাম ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান	১। ২।
হিন্দু ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান	১। ২।
খ্রিষ্ট ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান	১। ২।
বৌদ্ধ ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান	১। ২।

এবার আমরা ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শেষ অভিজ্ঞতার সর্বশেষ কাজটি করব। কাজটি হলো–

কাজ-১৮: ধর্মীয় সহাবস্থান সম্পর্কে তুমি যা জানো, অন্য শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীকে তা জানাও।

এই কাজটি কীভাবে করবে তা শিক্ষক তোমাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করে বুঝিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে তুমি পোস্টার, কার্ড, ছবি বা তোমার পছন্দমত যেকোনো উপকরণ ব্যবহার করতে পারো। ধর্মীয় সহাবস্থান সম্পর্কে জানানো শেষে যাকে জানিয়েছ তার কোনো প্রশ্ন থাকলে সে প্রশ্নের উত্তর দিবে। উত্তর জানা না থাকলে শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিয়ে পরবর্তীতে সেই শিক্ষার্থীকে জানাবে। নিশ্চয়ই এটি তোমাদের দুজনের জন্যই একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা হবে!

ফ্লাইওভার : উন্নয়নের পথে, পথ চলি একসাথে

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সরকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ/উদ্যোগ নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা), মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে মো. জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার, কালশি ফ্লাইওভার, হাতির ঝিল প্রকল্প, চার লেনবিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, বিআরটি প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্পসহ দেশব্যাপী অসংখ্য ফ্লাইওভার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সড়ক, মহাসড়ক ও নগরীকে যানজটমুক্ত করার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

৬ষ্ঠ শ্রেণি

ইসলাম শিক্ষা

পরনিন্দা (গিবত) করো না

–আল কুরআন

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য